No 129 April 1874

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১২৯ সংখ্যা। | বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ম ভাগ

সূচী।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভার সাহায্যে
ভারত সংস্কার সভান্তর্গত
বামাকুলোন্নতি বিভাগ হইতে
প্রকাশিত।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়—কলিকাতা মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
১৩ সংখ্যক ভবন।

মূল্য ।০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহক দিগের নিকট হইতে ডাকমাস্থল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

২। বাকী মূল্য প্রদান করিতে একমাসের অধিক বিলম্ব হইলে মফঃস্বলের পত্রিকা বন্ধ হইবে।

৩। প্রথম ৩।৪ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

৪। ষাণ্মাসিকের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ষাণ্মাসিকের এই দুই মাত্র সময় থাকিবে।

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য	২।০
মফঃস্বলের (ডাকমাস্থল সমেত)	২॥৶

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য।

কলিকাতার জন্য	১৶০
মফঃস্বলের (ডাকমাস্থল সমেত)	১।/০
প্রতিখণ্ডের মূল্য	।০
এককালে ১২ খণ্ডেরমূল্য ...	২।০

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মফঃস্বলস্থ যে সকল গ্রাহকের নিকট হইতে ১২৮০ সালের অগ্রিম মূল্য অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাহাদিগের প্রত্যেককে এক২ খানি পত্র লেখা গিয়াছে অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত শীঘ্র২ টাকা পাঠাইলে বাধিত হইব। নচেৎ পুনর্ব্বার পত্র লিখিতে গেলে বামাবোধিনীকে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। দেখিবেন এবিষয়ে ঔদাস্য না করেন।

বাঃ বোঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১২৯ সংখ্যা | বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ম ভাগ

নব বর্ষ।

সলিল প্রবাহ প্রায় বর্ষ পুরাতন
অনন্ত কালের গর্ভে হইল মগন,
আবার নবীন বর্ষ হর্ষ পুলকিত,
হাসি হাসি ধরণী শাসিতে উপনীত;
কে আছ সুবোধ ছাড় আলস্য হতাশ,
সাধি জীবনের ব্রত পূর্ণ কর আশ।

নূতন বৎসর আগত হইলে সকলকেই কিছু না কিছু চিন্তিত হইতে হয়। যে বৎসর চলিয়া গেল তাহা আমার হস্তে ছিল, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিবে না, আমি সেই সংবৎসর কালের মধ্যে কি করিলাম? ইহার পরিষ্কার উত্তর না পাইলে নূতন বৎসর যাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পুরাতন হিসাব পরিষ্কার না করিয়া নূতন হিসাব খুলিলে কেবল গোলযোগেই সকল কার্য্য পণ্ড হয়। কিন্তু এমন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কে আছেন যিনি বলিতে পারেন, পুরাতন বৎসরের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছি; এক বৎসরের জীবনের উদ্দেশ্য যত দূর সাধন করা যায়, করিয়াছি; দয়াময় ঈশ্বরের যত করুণা পাইয়াছি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার শুভ ইচ্ছা সাধনে নিযুক্ত হইয়াছি; জীবনের সমুদায় পাপ ও কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া, একান্ত মনে সৎপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি; জ্ঞান ও ধর্ম্ম ভূষণে আত্মাকে ভূষিত করিয়া পরলোকের অধিকতর উপযুক্ত হইয়াছি।

পুরাতন বৎসর স্মরণ করিলে অধিকাংশ লোকের মনে গ্লানি ও ধিক্কার উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা কত সময় জীবনের উদ্দেশ্য এক কালে ভুলিয়া ছিলেন, কত সময় উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াও আলস্য ও ঔদাস্য বশতঃ তাহা সাধন করিতে পারেন নাই, কত সময় সাধন করিতে গিয়াও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা উন্নতির কত শত সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া অসৎ সংসর্গে, অসৎ দৃষ্টান্তে আপনাদিগের অধোগতি আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা দেশাচার ও কুসংস্কারকে অন্তরে পোষণ করিয়া জীবনকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতিতে আলোকিত হইতে পারিতেন, কিন্তু হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটন করিলেন না। তাঁহারা প্রতিদিন যদি একটু একটু করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করিতেন, এত দিনে কত প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইতেন, কিন্তু অমূল্য ধন হেলায় হারাইয়াছেন। এই সকল বিষয় স্মরণ করিলে কাহার চিত্ত সুস্থির থাকিতে পারে? কিন্তু যখন আবার স্মরণ হয় যে আমাদিগের জীবনের উপর এক জন ন্যায় বিচারক আছেন, যাঁহার চক্ষু হইতে এক তিল পাপও এড়াইতে পারে না এবং যিনি প্রত্যেক পাপের উচিত শাস্তি দিবেন, তখন মন আরো কত বিকল হইয়া উঠে। যদি আমাদিগের সকল অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড লইতে হয়, তাহা হইলে কি আর আমরা ক্ষণকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারি? কিন্তু ঈশ্বর ক্ষমাশীল, তিনি বিচার করিবেন কিন্তু তিনি আমাদিগকে বিনাশ করিবেন না, অনন্ত মাতৃ স্নেহে চির দিন তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন, অনুতাপিতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার দিকে চাহিলে তিনি আমাদিগের সহস্র পাপ ক্ষমা করেন সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই অপরাধী, আমাদিগের প্রত্যেকেরই উচিত গত জীবনের পাপ সকল এক একটী করিয়া স্মরণ পূর্ব্বক অশ্রুপাত করি, অনুতাপের অশ্রুতে জীবনের সকল দোষ কলঙ্ক ধৌত হইয়া যাইবে, দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র আশীর্ব্বাদ লাভের উপযুক্ত হইব।

পুরাতন জীবনের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এখন আমরা নূতন বর্ষ যাপন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হই। ভাল রূপে প্রস্তুত হইলে কার্য্য

অর্দ্ধেক সম্পন্ন হইয়া থাকে, অপ্রস্তুত হইয়া কার্য্য করিয়া যাও, গ্রন্থি বিহীন সূত্রে মালা গাঁথার ন্যায় সকলই বিফল হইয়া যাইবে। কার্য্য সিদ্ধির দুইটী উপায়, আত্ম চেষ্টা ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর। কেবল আপনার চেষ্টায় সকল করিব মনে করিলে নিজের অহঙ্কারই নিজের পতনের কারণ হয়। কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া অলস হইয়া কালক্ষেপ করিলে, ঈশ্বরও সাহায্য দান করেন না। এই জন্য সিদ্ধিদাতা বিধাতার উপর অটল বিশ্বাস রাখিয়া উত্তম সহকারে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করা যায়, সিদ্ধি লাভের পক্ষে তাহাই প্রধান সাধন। ঈশ্বরের এই মহতী ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেই হইবে, আপনার হিত ও জগতের কল্যাণ সাধন করিতেই হইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিতে কাহার চিত্ত না গৌরবান্বিত হয়? সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরেরও এই অভিপ্রায়, তাঁহাকে সহায় করিয়া চলিলে ইহা অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে।

নব বর্ষের প্রারম্ভে আমাদিগের পাঠিকা ভগিনীগণকে আমাদিগের উপহার দিবার আর কিছুই নাই। তাঁহারা আমাদিগের এই বিনীত অনুরোধ গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইব।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

আহার।

আহার ব্যতীত মনুষ্যের জীবন ধারণ হয় না। আহারীয় পদার্থ সকল শরীরাভ্যন্তর্গত হইলে পরিপাক ক্রিয়াদ্বারা রস রক্তাদি রূপে পরিণত হয়, এবং ধাতু নামে আখ্যাত হয়—কেননা তদ্দ্বারা জীবন ধারণ ও শরীরের বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। নিয়ত শারীরিক কার্য্যদ্বারা শরীর নিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পরিশ্রম দ্বারা সেই ক্ষয় বৃদ্ধি পায়। যেমন কল চালনার্থে জল অগ্নি এবং অগ্নি রক্ষার্থে কয়লা যোগাইতে হয় এবং এই সকল বস্তু যত রূপান্তরিত হইয়া ফুরাইয়া যায়, তত তাহা আরো পুনঃ পুনঃ সংযোগ করিতে হয়, নতুবা কল চলে না, তদ্রূপ আহার ব্যতীত শারীরিক কার্য্য চলে না। কিন্তু কত আহার করিবে, কখন আহার করিবে এবং কি আহার করিবে এ সকল

কাহাকেও শিক্ষা করিতে হয় না। স্বাভাবিক ক্ষুধা,পিপাসা ও রুচি অনুসারে আহারাদি করিলেই যথেষ্ট হয়। আহার আবশ্যক হইলে ক্ষুধা বোধ হয়, পিপাসাদ্বারা পান করিবার ইচ্ছা হয়, কি আহার করা উচিত নহে তাহা রুচি দ্বারা জানা যায়। শারীরিক কার্য্য নিয়ত নিয়মিত রূপে চলিতেছে সুতরাং আহারও নিয়মিত ও পরিমিত হওয়া উচিত। পরিশ্রম অধিক করিলে অধিক আহার আবশ্যক হইতে পারে, অথবা কোন কারণ বশতঃ কখন কখন ক্ষুধা বৃদ্ধি বা ক্ষুধামান্দ্য হইতে পারে, কিন্তু ক্ষুধা বিবেচনা করিয়া আহার করিলে অত্যাচার হইবার আশঙ্কা থাকে না। শিশুদিগের আহারদ্বারা কেবল জীবন ধারণ হয় এমন নহে, শরীরের বৃদ্ধিও হইতে থাকে, অতএব তাহাদিগের আহার বিষয়ে অধিক মনোযোগ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ তাহারা আহারের পরিমাণ ও নিয়ম আপনারা বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগকে পরিমিত ও নিয়মিত রূপে আহার প্রদান করা মাতার কর্ত্তব্য। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন ও জীবন ধারণ মাত্র হইয়া থাকে এবং অধিক বয়সে শরীর আর বৃদ্ধি পায় না। গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে তিনি শিশুদিগের আহারের সময়, পরিমাণ ও খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে আহার দেন। যাহারা আহারের বিষয়ে আপনারা যত্ন লইতে পারেন, তাহাদিগের যথাকালে যথাবশ্যক আহার আয়োজন করিয়া দিলেই যথেষ্ট। যাহা হউক আহার বিষয়ে যে সকল সাধারণ নিয়ম সকলেরই জানা কর্ত্তব্য,সে সকল গৃহিণীর প্রথম জানা উচিত। *

আহারের প্রথম নিয়ম এই যে ইহা পরিমিত হওয়া আবশ্যক। কে কি পরিমাণে আহার করিবে, তাহার সামান্য নিয়ম সকলে আপনা হইতেই জানিতে পারে। যাহার যে পরিমাণ আহার করিলে আহারান্তে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় অথচ কষ্ট বোধ না হয়, তাহার সেই পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন বচন আছে যে উদরের অর্দ্ধাংশ আহারদ্বারা ও চতুর্থাংশ জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া অপর চতুর্থাংশ বায়ুর গতির জন্য খালি রাখা উচিত। বাস্তবিক সম্পূর্ণ আহার দ্বারা উদরের কেবল কষ্ট বোধ হয় এমন নহে,শীঘ্রই অজীর্ণতা দোষ জন্মে। প্রায় স্বভাবতঃই যথোচিত পরিমাণ আহার করিবার পর আহা-

রের ইচ্ছা আর থাকে না। লোভ বা উপরোধের বশ হইয়া অধিক আহার করা অতিশয় গর্হিত। লোভী ব্যক্তিরা বা বালকেরা উপাদেয় বস্তু পাইলে অধিক আহার করিতে ইচ্ছুক হয়, অতএব যে সকল বস্তুদ্বারা ক্ষুধাকে অতিক্রম করিয়া লোভের বৃদ্ধি হয়, সে সকল বস্তু অধিক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। শিশুকে এরূপ লোভ সম্বরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া মাতার কর্ত্তব্য। পরিবারের মধ্যে কাহার আহারের পরিমাণ কি রূপ তাহা জানা গৃহিণীর নিতান্ত আবশ্যক, কারণ তাহা না জানিলে কি পরিমাণে কি আহার প্রস্তুত রাখিবেন, তাহাও অনুমান করিতে পারেন না। স্বভাবের সমস্ত কার্য্যই নিয়মের বশীভূত, পাক কার্য্যও তদ্রূপ; সুতরাং যে সময়ে শারীরিক পদার্থ যত ক্ষয় হয়, এবং যে সময়ে যত বস্তু পরিপাকদ্বারা সেই ক্ষয়পূরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাও নিয়মের বশীভূত, অতএব আহারের পরিমাণেরও নিয়ম থাকা নিতান্ত আবশ্যক। তবে কারণবশতঃ ক্ষুধামান্দ্য বা ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে, তাহা লক্ষ্য রাখিয়া আহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা প্রায় নিয়মিত পরিমাণ হইতে অধিক অন্তর হয় না।

আহারের পরিমাণের যে রূপ নিয়ম থাকা আবশ্যক, আহারের বারের ও সময়ের নিয়ম থাকা ততোধিক আবশ্যক। কেহ দিনান্তে একবার আহার করে, কিন্তু অনেকে দুইবার আহার করিয়া থাকে। বাস্তবিক দুইবার যথেষ্ট পরিমাণে আহার করাই প্রসিদ্ধ নিয়ম। কিন্তু তদ্ভিন্ন অনেকের দুই এক বার লঘু আহার করা অভ্যাস থাকে। বাল্যকালে তিনবার ও আরো অল্প বয়সে চারিবার কিছু অধিক পরিমাণে আহার করা আবশ্যক। কিন্তু নিতান্ত পুনঃ পুনঃ আহার করা বিহিত নহে, আহারান্তে দুই প্রহরের মধ্যে আহার করিলে উদর বিশ্রাম পায় না এবং সুতরাং ইহার কার্য্য সুচাক রূপে চলিতে পারে না। কিন্তু শিশুদিগের প্রতি প্রহরে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। অতি দীর্ঘকাল আহার না পাইলেও অনেক দোষ ঘটে। এমন কি অত্যাহারজনিত রোগাপেক্ষা আহারের আতরিক্ত অভাবদ্বারা অধিক উৎকট ও ভয়ানক রোগ উপস্থিত হয়। যাহা হউক, আহার যেমন পরিমিত তেমনি নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। এক দিন এক সময়ে, অপর দিন অন্য সময়ে আহার করা উচিত নহে। প্রত্যহ যে ব্যক্তি যে সময়ে যতবার আহার করিবে সাধ্য

মতে তাহায় অন্যথা না হয়। কেহ কেহ মনে করেন নিতান্ত নিয়মাধীন, হইয়া চলিলে দৈবাৎ অনিয়ম সহ্য করিতে কষ্ট হয়। এটী ভ্রম। বাস্তবিক অনিয়ম অপেক্ষা নিয়মে চলিলে যদি দৈবাৎ অনিয়ম ঘটে তাহা সহজে সহ্য করা যায়।

আহারের সময় নির্দ্ধারিত করিতে হইলে নিজ নিজ কর্ম্মের নিয়মের সহিত ঐক্য করিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য; সেই জন্য সামান্যতঃ বেলা ৯ বা ১০ টার সময় অন্নাহার করা প্রায় অধিকাংশ লোকেরই নিয়ম। এই সময়ের পূর্ব্বে একবার লঘু আহার করা কর্ত্তব্য। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃক্রিয়া স্নানাদি শেষ হইলে দুগ্ধ বা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া থাকিবে, পরে যথাসময়ে শুদ্ধ আহার করিবে। কিন্তু যাহারা ৯ বা ১০ টার সময় অন্নাহার করেন, তাহাদের মধ্যে শিশু ও বালক ভিন্ন প্রায় কেহই উক্ত প্রথম লঘু আহারের নিয়ম রাখেন না। অন্নাহারের পর দুই প্রহর কালের মধ্যে আহারের প্রয়োজন থাকে না, পরে পুনশ্চ কিঞ্চিৎ লঘু আহার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ৬ বা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদিগকে ঐ সময়ের মধ্যেই ৩ ও ঘণ্টার পর আর একবার গুরুতর আহার দেওয়া আবশ্যক যথা মোহনভোগ, সুজির পায়স বা রুটি ও দুগ্ধ ইত্যাদি। এই আহারের পরে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরেই শেষ আহার। কেহ কেহ সে সময়ে অন্ন ব্যবহার না করিয়া রুটি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে উপকার আছে; কেননা তণ্ডুল অপেক্ষা গোধূম অধিক বলকর পদার্থ। যাহা হউক এই আহারের পরেই শয়ন করা উচিত নহে। অল্পবয়স্ক বালকেরাও আহারের পর প্রায় এক ঘণ্টাকাল জাগ্রত থাকিবে।

আহারের বিষয়ে আর একটি নিয়ম সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য। আহারের পূর্ব্বে ও পরে মনের ও শরীরের সুস্থির ভাব থাকা আবশ্যক, কেননা তৎকালে শরীরের ক্লান্তি বা মনের চাঞ্চল্য থাকিলে পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। আহারের সময় সুস্থির হইয়া উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিয়া আহার না করিলে উহা উত্তম রূপে লালামিশ্রিত হয় না ও পরিপাক হয় না। আহারের সময় অধিক বাক্যালাপ ও হাস্য নিষেধ আছে, এ নিষেধ যুক্তিসিদ্ধ।

আহারীয় পদার্থ পুষ্টিকর ও সুপচ্য হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে

পাকযন্ত্রের কার্য্য নিষ্ফল হয় এবং অজীর্ণতা দোষ জন্মাইয়া আহারের অভিপ্রায় যথেষ্ট সিদ্ধ হয় না ও শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। এদেশের প্রধান আহার অন্ন। অন্নে যদিও বলকর পদার্থ অধিক নাই, তথাপি ইহা স্নিগ্ধতা শক্তিপ্রযুক্ত এদেশীয় লোকদিগের বিশেষ উপকারী। এদেশীয়েরা অন্নের পরিবর্ত্তে কোন বস্তুই ব্যবহার করিতে পারেন না। অন্য বস্তুতে তাহাদিগের তাদৃশ রুচিও নাই এবং ব্যবহার দ্বারা রুচি হইলেও কোন বস্তুই তাদৃশ সুলভ নহে। এই উপযোগিতা মনুষ্যের অনুকল্পিত নহে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং যে সকল বিকৃতরুচি ব্যক্তি অন্নের নিকট বিদায় লইতে অভিলাষী, তাঁহারা যথেচ্ছাচার করুন, কিন্তু বঙ্গগৃহিণীরা গৃহ অন্নে পূর্ণ রাখিতে যেন ত্রুটি না করেন। তণ্ডুলে তেজস্কর পদার্থ অধিক নাই বটে, কিন্তু অন্নের সহিত যে জল ব্যবহার করা যায়, তাহাদ্বারা সে অভাব পূরণ হয়, কেননা জলে মাংসের তেজস্কর অংশ প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু ছোলা অরহর ও কলাই উদরাময় রোগীর কুপথ্য।

আহারের বিষয়ে আর একটি নিয়ম এই নিত্য এক প্রকার আহার করা উচিত নহে, আহারীয় পদার্থের পরিবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু তজ্জন্য প্রধান আহারীয় বস্তুর পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা নাই। অন্ন, রুটি, দুগ্ধ ইত্যাদি বস্তু নিত্য আহারের উপযুক্ত। ব্যঞ্জনাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার করিলেই যথেষ্ট হয়। এ বিষয়েও ঈশ্বর স্বয়ং উপায় করিয়া দিয়াছেন। ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফলমূলাদি উৎপন্ন হয় এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যেং কালে যে বস্তু আহার করিলে উপকার হয় সেইকালে সেই বস্তুই উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটু বিবেচনাশক্তি চালনা করিলে এ জন্য বিশেষ শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। অনেকে অতিরিক্ত দ্রব্যগুণ বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিতে চেষ্টা করিয়া রুগ্ন হইয়া পড়েন। সামান্য আহারীয় দ্রব্য সকলের মধ্যে এইটির এই দোষ ওটির ও দোষ এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আহার করিলে কোন দ্রব্যই খাওয়া হয় না এবং সেই সকল বস্তুতে শরীরের স্বাস্থ্যোপযোগী যে সকল পদার্থ থাকে তাহাদিগের অভাবে বরং হানি হইবার সম্ভাবনা। কি কি দ্রব্য গুরুপাক কি কি দ্রব্য কোন্ রোগের কুপথ্য, ইত্যাদি জ্ঞানানুসারে পথ্যাপথ্য বিধান করিলেই সামান্যতঃ যথেষ্ট হয়।

অসভ্যজাতির বিবরণ।

এই পত্রিকার পুর্ব্ব কয়েক সংখ্যায় বিজাতীয় বন্য জাতিদিগের ব্যবহার লিখিত হইয়াছে। এবার স্বদেশীয় অসভ্যদিগের বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারত মহারাজ্য বহু বিস্তৃত। এখানে নিগ্রো, মোগল ও ককেসীয় জাতিরা এক এক কালে আধিপত্য করিয়াছেন এবং উহাদিগের বংশধরেরা অদ্য পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই নিমিত্তই অত্রতা নিবাসী দিগের আকার ও পরিচ্ছদ প্রণালী এত বিভিন্ন এবং পরস্পরের আচার ও ব্যবহার এরূপ স্বতন্ত্র ও কখন কখন বিপরীত। যেরূপ পুরাণ মতে কাশী বা শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলে সকল তীর্থের ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ এদেশীয় অনার্য্য বংশীয়দের বিবরণ পাঠ করিলে পৃথিবীর যাবদীয় অসভ্য দিগের রীতি নীতি এক প্রকার জানা যাইতে পারে। কোল, সাঁওতাল, ধাঙ্গড়, প্রভৃতি জাতিদিগের দৃষ্টান্ত কলিকাতায় অনেক দেখা যায়। ইহারা অনেক প্রকার অখাদ্য খায়, মেথর নয় অথচ ময়লা সাফ করে এবং পুরুষেরারও অলঙ্কার পরে ও মাথায় চুড়া বাঁধে। এতদ্ভিন্ন ইহাদিগের বিষয় আমরা প্রায় কিছু মাত্র অবগত নহি। কিন্তু অনুধাবন করিলে দেখা-যায় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা অনেক বিষয়ে ইহাদিগের অনুকরণ মাত্র করি। শীতলা, মনসা, বাবা ঠাকুর প্রভৃতি আর্য্যদিগের প্রকৃত দেবতা নয়, চড়ক পূজা, নরবলী প্রভৃতি আদিমবাসীদিগের প্রথা এবং আমাদিগের অধিকাংশ স্ত্রীআচার বন্যদিগের হইতে গৃহীত হইয়াছে। আর্য্য-জাতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত মিশ্রিত হওয়াতে মূল সংস্কৃত ভাষা, হিন্দি বাঙ্গালা উড়িয়া প্রভৃত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়াছে; এবং তাহাদিগের ব্যবহার ও ধর্ম্মেরও কিয়ৎ পরিমাণে বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হইয়াছে। এ সমস্ত অসভ্য-দিগের বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে না জানিতে পারিলে, আমাদিগের ইদানীন্তন অবস্থা বিশিষ্ট রূপে বুঝিয়া উঠা ভার। এই নিমিত্ত আমরা পার্শ্বস্থিত অসভ্যদিগের বৃত্তান্ত সর্ব্বাগ্রে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

খন্দ জাতি।

বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং মধ্য প্রদেশে এই জাতির

বাস স্থান। আমাদিগের দেশে ও উড়িষ্যার করদ মহলে ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ৫০ সহস্র। ইহাদিগের অবয়ব অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের ন্যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহারা রণদেবতা কার্ত্তিক, সীমাদেব চন্দ্র ও সূর্য্য, শিকার দেবতা ষষ্ঠী, শীতলা, পর্ব্বত, অরণ্য, জলদেব ও গ্রাম্যদেব প্রভৃতি এবং কতকগুলি হিন্দু দেবতা পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা বুড়া দেব ও তাঁহার পত্নী তারী দেবী অর্থাৎ পৃথিবী ইহাদের নিকট অধিক মান্য। আমাদিগের ন্যায় ইহাদিগের কতক লোক পুরুষ দেব এবং কতক লোক শক্তির উপাসক। ইহাদিগের শাক্তেরা কহে যে অনুর্ব্বরা পৃথিবীকে দেবী স্বীয় রুধিরে অভিষিক্ত করাতে উহা উর্ব্বরা হইয়াছে এবং সেই অবধি ইষ্টধাত্রীর তৃপ্তার্থ এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মধ্যে মধ্যে নর বলী প্রদান করেন। কিন্তু শক্তিবিদ্বেষী অপর সম্প্রদায়েরা কহে যে দেব দেব মঙ্গলময়ের পত্নী উঁহার পৃষ্ঠদেশ চুলকাইতে অস্বীকার করায় (দম্পতি মধ্যে এরূপ কলহ ঘটনা কিছু বিচিত্র নহে) তিনি উদ্ভিদ, ও পরে প্রাণী এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্যকে তাঁহার পূজার্থ সৃজন করেন। মনুষ্যেরা সর্ব্বপ্রথম নিষ্পাপ ও নীরোগ ছিলেন, কষ্ট কি তাহা জানিতেন না এবং দেবতাদিগের সহিত তাহাদের কথোপকথন হইত। তাহাদিগের সুখ সচ্ছন্দতা দর্শনে ক্রূর-মনা দেবীর হৃদয়ে ঈর্ষ্যার উদয় হইল। সয়তানের ন্যায় ইনি অধিকাংশ নরকে ভ্রষ্টাচারী করেন। যে কয়েক জন তাঁহার প্রলোভনে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা ক্ষুদ্র দেব হইলেন। সংসারে পাপের অবতরণ হেতু পৃথ্বী ফল হীন ও জন্তুগণ হিংস্র হইয়া উঠিল এবং নর এককালে শক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। এই উপলক্ষে আদি দেব ও দেবী মধ্যে মহা কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে বুড়া দেব জয়ী হইয়া স্বীয় পত্নীকে এই অভিসম্পাৎ দেন যে 'কষ্টে তুমি সন্তান প্রসব করিবে' সুতরাং স্বীয় ভক্তগণকে কহিয়া দেন যে নারীগণই সকল অনর্থের মূল এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যার অতিরিক্ত হইলে ইহাদিগকে নষ্ট করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এবম্বিধ অনুজ্ঞা হেতু এই সম্প্রদায় কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই প্রায় তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। উভয় দল পরস্পরকে নরঘাতক বা কন্যা হন্তারক বলিয়া গালি দেয় এবং পরস্পর মধ্যে আদান প্রদান করে না।

শাক্তেরা অনাবৃষ্টি ও মন্বন্তর হইলে, নর ও গ্রাম্য পশ্বাদির মধ্যে মহামারি দেখা দিলে, অথবা যুদ্ধে জয়ী হইলে নরবলী দেয়। বীজ বপন ও ফসল কর্ত্তন কালে, প্রধান ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথোচিত শস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মিলে, বা তাহার পরিবার মধ্যে কাহারও পীড়া বা মৃত্যু হইলে, এতদ্ভিন্ন কাহার নিজ সন্তানকে বাঘে মারিলে বা অন্য কোন কারণ বশতঃ মানত থাকিলেও নরবলী দেয়। বলীদিগকে কেদি বা মেরিয়া বলে। পান নামক নিকৃষ্ট হিন্দু জাতীয়েরা নিম্নদেশ হইতে শিশু চুরি করিয়া আনিয়া আপন কুটুম্বদিগকে বিক্রয় করে। দেশ মধ্যে ৪।৫ শত বলি নিয়ত জাওয়ান থাকে। যতকাল না আবশ্যক হয়, তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে উপাদেয় সামগ্রী আহার করে। উহাদিগের সহিত কাহার কন্যা বা ভগিনীর পানিপীড়নে অভিলাষ হইলে,ইহা সম্মানসূচক ও দেবকৃপার চিহ্ন বোধ করিয়া গৃহস্থ তৎ-দণ্ডেই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কিন্তু উহাদিগের ঔরষজাত সন্তানেরা মেরিয়া বলিয়া পরিগণিত হয়। মেরিয়ার সকল সুখ আছে, কষ্টের মধ্যে কেবল ক্ষৌর কার্য্য নিষিদ্ধ। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কারণ উপস্থিত হইলে ও নরবধের নিতান্ত আবশ্যকতা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্থির হইলে সর্ব্বপ্রথম মেরিয়ার মস্তক মুণ্ডন করে, পরে যাজক সহ দেবীর নির্দ্দিষ্ট পবিত্র বনে সকলে গিয়া তাহার নিকট সবিশেষ আবেদন ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। তিন দিবস কাল অতিরিক্ত পান ভোজন ও নৃত্য হইয়া থাকে। পূজার প্রথম দিন মেরিয়া উপবাসী থাকে, পর দিবস প্রাতে তাহাকে স্নান ও নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া বাদ্য সমভিব্যাহারে নাচিতে নাচিতে দেবীর নিকট লইয়া যায়। বন মধ্যে একটী খুঁটি পুতিয়া তথায় মেরিয়াকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ঐ সময়ে তাহার গাত্রে তৈল ঘৃত হরিদ্রা মাখায় এবং পুষ্প চন্দন দিয়া তাহার অঙ্গ বিভূষিত ও পূজা করে। তাহার পরিধেয়, অলঙ্কার বা গাত্র-ক্লেদ বিশেষ শুভকর জানিয়া সকলে পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি করে। তৃতীয় দিবসে সকলে গান নেসা এবং ভক্তি রসে উন্মত্ত প্রায় হইয়া মেরি-য়ার নিকটে আসে ও তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়, কারণ বন্ধনাবস্থায় বধ অবৈধ। কিন্তু পাছে পালায়, এই আশঙ্কায় অনেকে হয় তাহাকে চুরচুরে মাতাল করিয়া রাখে, বা তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া দেয়। এই সময়ে পুরো-

হিত ও মেরিয়া পরস্পর মধ্যে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়। যাজক ব্রত কথার ন্যায় প্রথমতঃ পূজা প্রচারের উপন্যাস বলেন, ইহাতে সাধারণের হিত, মেরিয়ার দেব কার্য্যে সদ্‌গতি এবং ইহাতে যদি কিঞ্চিৎ দোষ থাকে তাহাতে তাহারা অপরাধী নহে, কারণ তাহারা ন্যায্য মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছেন বলেন। মেরিয়া আপন ইচ্ছায় আসে নাই, তাহাকে চুরি করিয়া বা বল পূর্ব্বক আনা হইয়াছে সে ইত্যাদি অনেক ওজর আপত্তি করে মাত্র। অতঃপর তাহাকে হাড়িকাষ্ঠে নিক্ষেপ করে এবং পুরোহিত অস্ত্র দ্বারা স্বল্প আঘাত মাত্র করিলে অপরেরা আসিয়া একটু একটু করিয়া অঙ্গ হইতে সমস্ত মাংস তুলিয়া লয়, মস্তক ও নাড়িভুঁড়ি স্পর্শ করে না। পর দিন তাহার অস্থি ভস্মসাৎ করে এবং একটী মেষ বলি দেয়। ছাই সমস্ত ভাগ করিয়া লইয়া সকলে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেয় অথবা গুলিয়া গৃহাদিতে লেপ দিয়া থাকে। মেরিয়ার পিতা বা বিক্রেতা তৎকালে উপস্থিত হইলে তাহাকে একটী গো দান করে এবং অপর একটী বলী দিয়া সকলের ভোজ সম্পন্ন করে। সংবৎসর অতীত হইলে দেবীর নিকট শূকর শাবক উৎসর্গ ও হনন করিয়া কর্ম্ম শেষ করে। পৃথ্বী দেবী ব্যাঘ্র রূপিণী হইয়া সন্তান বিনষ্ট করিলে তাহার তৃপ্ত্যর্থে ও ভবিষ্যতে আর না উপদ্রব করেন এজন্য একটী নরবলী আবশ্যক। কিন্তু সঙ্গতিহীন হইলে তৎকালে একটী ছাগের কর্ণ ছেদ করিয়া রাখে পরে সংবৎসরের মধ্যে মানত পালন করে। কোথায়ও বা মেরিয়াকে দম আটকাইয়া মারে এবং ইহার পৃষ্ঠস্থিত পেশী টুকরা টুকরা করিয়া আপন আপন ক্ষেত্রে লইয়া পোতে এবং যে পর্য্যন্ত না যজ্ঞ স্থানে পুনর্ম্মিলিত হইয়া একটী মহিষ বলী দেয়, সে পর্য্যন্ত কেহ কাহার সহিত বাক্যালাপ বা স্নান ভোজন করে না। অনাবৃষ্টি জন্য মেরিয়াকে পূজার স্থলে বলিদান করে এবং যে পরিমাণে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন হয়, সেই পরিমাণেই দেবী তুষ্ট হইয়া জল বর্ষণ করেন, ইহাদিগের স্থির বিশ্বাস। হা জগদীশ! তোমার নাম লইয়া এই সংসারে কত লোক কতই দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। ধন্য তোমার সহিষ্ণুতা! তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃজিত পদার্থের আচার

দেখিয়া কত শত সহৃদয় বিচক্ষণ ব্যক্তি তোমার গুণ ও অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহ করিতে অগ্রসর হন। স্বার্থপরতাই সকল প্রচলিত ধর্ম্মের আকর। এই স্বার্থতাই কি মায়া! ইহার হস্ত হইতে উদ্ধার হওয়ার নাম কি মুক্তি? এবং অন্তে কি নিঃস্বার্থ হইয়া আমরা তোমার সহবাসের যোগ্য হইব? আমরা অজ্ঞ, কিন্তু চির কালই এ অবস্থায় থাকিব না, কখন না কখন এ রহস্য বুঝিব। এই মাত্র ভিক্ষা যেন স্বার্থপরতা শূন্য হইয়া তোমার চিন্তা ধ্যান ও প্রার্থনায় মতি হয়।

বঙ্গ মহিলা।

আজ কাল বঙ্গ মহিলাগণ সাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকেরই এই প্রকার মত যে, বঙ্গ মহিলাগণ, অল্পমাত্র লেখা পড়া শিখিয়া বাবু হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা এত অলস হইয়া পড়িয়াছেন যে, আলস্য জন্য তাঁহাদের অধিকাংশের শরীর দুর্ব্বল এবং রোগের আধার হইতেছে। বঙ্গ মহিলা দিগের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে। দুঃখী অনাথদিগকে দান করিলে পরলোকে পুণ্য হয় এ বিশ্বাস না থাকাতে তাঁহারা দুঃখীদিগকে দান করিতে যত্নবতী নহেন। অতিথি অভ্যাগত দিগের সেবা করিতে এবং আত্মীয় কটুম্ব দিগকে আহার করাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা পতিকে ভক্তি না করিয়া সময়ে সময়ে অভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক মর্ম্মপীড়া জনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগকে অমান্য করিয়া তাঁহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। গৃহকর্ম্মে মনোযোগ না দিয়া তাসখেলা প্রভৃতি বৃথা আমোদে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। গৃহকর্ম্মের মধ্যে কেশবিন্যাসই প্রধান কার্য্য হইয়াছে। পতিপুত্রের সেবাভিন্ন, বাটীর অন্য কাহারও সেবাতে রুচি নাই। রোগী ও বিপন্ন আত্মীয় বন্ধু এবং প্রতিবেশীদিগের সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্তি নাই। এই রূপে বঙ্গ মহিলাগণ স্বার্থপরতার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া স্বাভাবিক কোমলতাকে বিনাশ করিতেছেন।

উপরে বঙ্গ মহিলাদিগের যে সকল গুরুতর দোষের বিষয় উল্লিখিত

হইল, তাহার কারণ কি? অনেকে বলিয়া থাকেন যে, অল্পবিদ্যাই ইহার কারণ। অল্প লেখা পড়া শিখিয়াই প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা হয়, অথচ কোন প্রকার সুনীতি শিক্ষা ও অভ্যাস করা হয় না। বাল্য কাল হইতে পুস্তক পাঠ ও কার্পেটে ফুল তুলিতেই শিক্ষা দেওয়া হয়, গৃহকর্ম্ম করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না, সুতরাং তাহাদিগকে চিরদিনই গৃহকার্য্যে অপটু থাকিতে হয়।

আমাদিগের বোধহয়, পিতামাতা এবং স্বামীর দোষেই বঙ্গমহিলাদিগের এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। পিতামাতা বালিকাকে আদর পূর্ব্বক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, কন্যা অল্পমাত্র লেখা পড়া শিখিলে এবং কার্পেটে ফুল তুলিতে পারিলে তাঁহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। তাঁহারা কন্যাকে কখন বিবীর পোষাক পরাইয়া, কখন নানালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, কিন্তু স্নেহ বা মোহবশতঃ কন্যাকে গৃহ কর্ম্ম শিক্ষা দিতে ভুলিয়া যান। কন্যাও আদরের পুত্তলিকা হইয়া বাল্যকাল অতিবাহিত করেন, সুতরাং গৃহ কর্ম্ম শিক্ষা ঘটিয়া উঠে না। তাহার পর দেশীয় রীতি অনুসারে কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কালেজে সুশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়। সুশিক্ষিত যুবা নানা প্রকার কাব্যালঙ্কার পাঠ করিয়া নব পরিণীতা পত্নীকে কখন শকুন্তলা কখন বা কাদম্বরী মনে করিয়া সমাদর করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ মনে করিয়া যথাসাধ্য আয়োজন পূর্ব্বক পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পিতামাতা গুরুজনে বধূকে গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে শিক্ষিত পুত্র বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিতে থাকেন—কি নিষ্ঠুরতা! এমন কোমলাঙ্গে কার্য্যভার! প্রাচীন দিগের হৃদয় কি কঠিন!

পত্নী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এবং শিক্ষিত যুবা উপার্জ্জনশীল হইলে, তখন মাতা "বাবার পরিবার" স্ত্রী গৃহকর্ত্রী। স্ত্রীর সেবার জন্য দাসদাসী নিযুক্ত হইল। স্বামী কায়মনোবাক্যে স্ত্রীসেবায় নিযুক্ত হইলেন, স্ত্রীও নানা উপায়ে স্বামীকে অধীনতা স্বর্ণশৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে যত্নবতী হইলেন। অতি অল্প দিনেই স্ত্রীর আশা পূর্ণ হইল। তথাপি লোকে বঙ্গমহিলাকে অধীনা অবলা বলিয়া সম্বোধন করে। যাঁহাকে এত আদর করিয়া পূজা করা হইল,

এখন তাঁহাকে অলস বলিয়া ভর্ৎসনা করা কি অন্যায় নহে? তিনি সহস্র কটুবাক্য বলিলেও কিছু বলিবার অধিকার নাই, কারণ তাঁহার নিকট দাসত্ব খতে ইচ্ছাপূর্ব্বক নাম স্বাক্ষর করা হইয়াছে। অতএব স্বকৃত ব্যাধির ন্যায় বঙ্গমহিলাদিগের দোষ গুলিও বহন করা কর্ত্তব্য। তবে কি শিক্ষিতদিগেরই অঙ্গনাগণের আলস্য প্রভৃতি নানা প্রকার দোষ? এ কথা সত্য নহে, কারণ অত্যন্ত পল্লীগ্রামে ঘোর হিন্দু পরিবারের নিতান্ত নিরক্ষরা মহিলা-দিগকেও বাবুগিরি করিতে দেখা যায়। তবে যে কেবল শিক্ষার দোষে ঐরূপ অনিষ্ট হইতেছে, তাহা নহে। কালের গতি অনুসারেই লোকের ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সময়ের বেগকে নিবারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। তথাপি চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

মহিলাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা ও গৃহ কর্ম্ম শিক্ষা এক সঙ্গে প্রদান না করিলে তাঁহারা চিরদিনই গৃহকর্ম্মে অপটু থাকিবেন। যে সকল প্রাচীন রীতি রক্ষা করিলে সমাজের মঙ্গল হয়, যত্নপূর্ব্বক তাহা পালন করিতে হইবে। যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক মহিলাদিগকে ফুল বাবু করিতে চান তাঁহারা করুন, কিন্তু যাঁহারা সংসারকে সুখের স্থান করিতে চান, তাঁহারা যেন পত্নীকে সুখ দুঃখভাগিনী করিয়া গৃহ কর্ম্মে সুদক্ষা করেন। পাঠিকাগণ! তোমাদি-গের প্রতি যে সকল শোচনীয় দোষের আরোপ করা হইতেছে, তাহা কি তোমরা শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে, না তাহা সংশোধন করিতে যত্নবতী হইবে? তোমরা গৃহলক্ষ্মী, তোমরা যদি গৃহ কর্ম্মে অপটু হও, তবে সংসার দুঃখময় হইবে। তোমরা যদি প্রিয় বাক্যে সম্ভাষণ না কর, তাহা হইলে যে সংসার শ্মশান সমান হইবে। তোমরা কৃপাদৃষ্টি না করিলে সংসার অন্ধকারময়। হে দেবীগণ! তোমরা গৃহ কর্ম্মে সুপটু হও, প্রাচীনাদিগের ন্যায় দুঃখীদিগকে দয়া কর, অতিথি সেবা কর, পতিব্রতা হও এবং গুরুজন-দিগকে সম্ভ্রম কর। তোমাদের দৃষ্টান্তে বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হউক, বঙ্গ-মহিলাদিগের নামে আর যেন কেহ দোষারোপ করিতে না পারে।

অলঙ্কার।

প্রীতিরস।

আমরা গত বারে প্রীতি কাহাকে বলে এবং পাত্র ভেদে তাহার যে প্রকার ভেদ হয় উল্লেখ করিয়াছি। অদ্য আমরা আলঙ্কারিক গণের রীতির অনুসরণ করিয়া উহার বিভাব অনুভাবাদি (কারণ ও লক্ষণাদি) নিরূপণ করিতেছি।

আমাদিগের হৃদয়স্থ প্রীতি যদ্দ্বারা উত্তেজিত অথবা আস্বাদিত হয়, তাহাকে বিভাব বলে। এই বিভাব দুই প্রকার আলম্বন এবং উদ্দীপন। যাহা অবলম্বন করিয়া প্রীতির উদ্রেক হয়, তাহাকে আলম্বন বলে। প্রীতির বিষয় বা পাত্র প্রীতির আলম্বন। প্রীতিপাত্রের যে গুণাদি অবলম্বন করিয়া ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহাকে উদ্দীপন বলে। চিত্তস্থ ভাব বোধক যে কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহাকে অনুভাব বলে। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় এই আটটিকে পূর্ব্ব আলঙ্কারিকেরা সাত্বিক ভাব বলিয়া স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ সকল গুলিকেও সাধারণতঃ অনুভাব শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিতে পারি। প্রীতি, ঘৃণা, ক্রোধ, বিস্ময়, ভয়, শোক, হাস্য, উৎসাহ এই আটটিকে আমরা পূর্ব্বে স্থিরতর বা স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি। এ সকলের সঙ্গে আবার কতকগুলি ভাব মিলিত হইয়া সঞ্চরণ করে, উহাদিগকে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব বলে। স্থায়ী ভাব এই সকলকে নিয়ত বশবর্ত্তী করিয়া রাখে। অনুকূল ভাব সকল উহার সঙ্গে মিলিত ভাবে কার্য্য করে, প্রতিকূল ভাব তিরোহিত হইয়া যায়।

কাব্যে প্রীতির বিষয়কে সৌন্দর্য্যাদি বিবিধ গুণের আধার বলিয়া বর্ণন করা বিধেয়। কারণ উহাতে আনন্দবর্দ্ধক গুণ না থাকিলে অপরে আনন্দানুভবরূপা প্রীতির উদ্রেক হইবার সম্ভাবনা থাকে না। নিঃস্বার্থতাকে আমরা প্রীতির প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। প্রীতির উচ্চতাও নিঃস্বার্থতা অনুসারে। প্রীতির উদ্রেকের জন্য যদি আনন্দজনক গুণের অপেক্ষা রহিল, তবে নিঃস্বার্থ হইল না একথা বলা যায় না। পুষ্পের সৌন্দর্য্য

দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ হই, তাহাতে আমাদিগের আনন্দ অনুভব হয়, ইহা সৌন্দর্য্যের স্বভাব, তাহাতে আমাদিগের কোন কর্তৃত্ব নাই। গুণের প্রতি আমাদিগের হৃদয় স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া আনন্দানুভব হইয়া থাকে। যদি আমরা আনন্দ লাভ লক্ষ্য রাখিয়া, তৎপ্রতি চিত্তনিবেশ করিতাম, তাহা হইলে স্বার্থ সম্বন্ধ হইত। যে স্থলে বস্তুর স্বভাব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আনন্দানুভব হইল, সে স্থলে স্বার্থভাবকে আকৃষ্ট হইবার কারণ বলিয়া কে নির্দ্দেশ করিতে পারে?

প্রীতি পাত্রের গুণ অপেক্ষা করিয়া প্রীতির উদ্রেক হয় বলিলে অনেকের নিকট সে প্রীতি নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। মাতা তাঁহার শিশু সন্তানকে যে প্রীতি করেন, তাহা কি তাহার গুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া? যদি তাহা হইত, দুরাত্মা সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ মমতা কখনই দেখা যাইত না। এস্থলে আমরা গুণ কাহাকে বলি সর্ব্বাগ্রে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। গুণ বলিলে শরীর এবং মনঃ এ উভয়নিষ্ঠ গুণই বুঝাইয়া থাকে। সদ্য প্রসূত শিশুসন্তান হইতে পরিণত বয়স্ক বা বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ইহাদিগের সকলেতেই বিশেষ বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক সৌন্দর্য্য আছে। শারীরিক অপেক্ষা মানসিক সৌন্দর্য্য প্রীতির প্রকৃত উদ্দীপক। কে বলিবে সদ্য প্রসূত সন্তানে এরূপ উদ্দীপকতা শক্তি নাই? সন্তানের সন্তানত্ব, তাহার অসহায় নির্ভরের ভাব কি স্নেহের উদ্দীপক এবং পরিপোষক নহে? শিশুসন্তানের জন্মের অতি পূর্ব্ব হইতে মাতার হৃদয়স্থ স্বাভাবিক স্নেহ সন্তান জ্ঞানে তৎপ্রতি অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে এবং সন্তান বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল তন্নিষ্ঠ গুণ স্বতঃ প্রতীত হয়, উহা কল্পনা পথে মাতার মনে পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাতে আমরা প্রীতির গুণাপেক্ষিতা সহসা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হই না। স্বামী স্ত্রী বন্ধু প্রভৃতির প্রতি প্রীতির প্রথম উদ্রেক সময়ে আমরা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে সমর্থ হই।

এ স্থলে একটী বিষয় বলা আবশ্যক। মাতা সন্তান বলিয়া সন্তানকে স্বভাবতঃ যে স্নেহ অর্পণ করিলেন, তাহা নিত্য কালের জন্য অর্পিত হইল। সন্তান পর বয়সে যতই দুরাত্মা হউক না কেন, তিনি আর তাহাকে

কখন তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না—করিতে পারেন না। নিঃস্বার্থ প্রীতির এইটি প্রধান লক্ষণ এবং ইহাকে গুণান্তর নিরপেক্ষ প্রীতি বলা যাইতে পারে। সম্বন্ধ জনিত প্রীতি ইহারই নাম। বস্তুতঃ প্রীতি যখন এক জনের প্রতি নিবিষ্ট হইল,* চিরকালের জন্য উহা সেই ব্যক্তিতে নিবদ্ধ থাকে। এই প্রীতি শোকের আকার ধারণ করিতে পারে, কিন্তু কখন বিনষ্ট হইবার নহে।

প্রীতির গুণ—সাপেক্ষতা এবং তাহার নিত্যত্ব আমাদিগকে আর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিতে হইতেছে। এ দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাইব, স্পষ্টতঃ যেখানে কোন গুণাপেক্ষিতা লোকে দেখিতে পায় না, সেখানেও গুণাপেক্ষিতা অবস্থান করিতেছে। মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের, বিশেষতঃ পাপীর প্রতি সাধুর প্রেমকে আমরা দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিতে পারি। সাধু ঘোরতর পাপীকে কি বলিয়া প্রীতি করেন? মনুষ্য বলিয়া। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করে। মনুষ্যত্ব বলিতেই মনুষ্য প্রকৃতিস্থ কতক গুলি স্বাভাবিক উচ্চতর গুণ বুঝায়। পাপী প্রতিপদে সেই সকলের অবমাননা করিলেও উহা অবিনাশ্য। সাধু পাপীর হীনতাতে শোক করেন অথচ তাহার সে উচ্চগুণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন। এ প্রীতি চিরস্থায়ী, কোন অবস্থাতে পরিবর্তন হয় না। "প্রীতি প্রীতিপাত্রকে সুন্দর করিয়া লইয়া প্রীতি করে" এই স্বর্গীয় ভাবময় কথার গূঢ় তাৎপর্য্য ইহাতেই বুঝা যায়। যেখানে অন্যে প্রীতি করিবার উপযোগী গুণ দেখে না, সেখানেও প্রীতি অলক্ষিত গুণ দেখিতে পায় এবং তদুপরি আপনাকে স্থাপন করে। নিঃস্বার্থ প্রকৃত প্রীতি এইরূপ নিয়ত অদৃশ্য আদর্শ জগতে বাস করিয়া থাকে। যে আদর্শ সৌন্দর্য্য

* প্রীতির চিরস্থায়িত্বের কারণ নির্দ্ধারণ করা কিছু সুকঠিন ব্যাপার নহে। প্রীতি যে গুণ অবলম্বন করিয়া স্থায়িতা লাভ করে, উহা চিরস্থায়ী। সন্তানের সন্তানত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ইত্যাদি গুণ কোন কারণে কোন সময়ে বিনষ্ট হইতে পারে না। মাতা জানেন সন্তান সহস্র অবাধ্য হইলেও প্রকৃত সন্তানত্ব কখন বিনষ্ট হইবে না। সহস্র পাপ করিলেও মনুষ্যত্বের বীজ কে কোথায় বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে?

প্রীতির উদ্রেক এবং পরিপোষণ করে, প্রেমিক ভিন্ন তাহা আর কাহার নয়ন গোচর হয় না।

এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। দাস প্রভু, পিতামাতা পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগিনী, স্বামী স্ত্রী, বন্ধু এবং মনুষ্য প্রীতির অবলম্বন। আচার্য্য শিষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধও ইহার অন্তর্ভূত বুঝিতে হইবে। প্রীতি ইহাঁদিগকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। আলঙ্কারিক রীতি অনুসারে এই সকলের বিভাবাদি নিরূপণ করা যাইতেছে।

প্রেম ও পরসেবা।*

স্বার্থপরতা মনুষ্যকে একটী অতি ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। কিসে আপনার এবং আপনার ক্ষুদ্র পরিবারের ভাল হয় স্বার্থপর ব্যক্তির কেবল এই ভাবনা, এই চিন্তা এবং এই কার্য্য। তাহার সংসার রূপ সেই ক্ষুদ্র প্রাচীরের বাহিরে কি হইতেছে তাহা সে ভাবিবে না। আপনার সুখে সে আপনি সুখী, এবং আপনার দুঃখে সে আপনি দুঃখী। পরের দুঃখে তাহার দুঃখ হয় না, পরের সুখে তাহার সুখ হয় না। এই ভয়ানক অবস্থায় যাহারা থাকে, স্বর্গের সুখ কি তাহারা বুঝিতে পারে না। তোমরা আর এরূপ বদ্ধ ভাবে থাকিতে পার না। এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার প্রেমরূপ স্বর্গধামে লইয়া যাইতেছেন। যে পথে যাইতেছ, সেই পথে চলিবার জন্য ঈশ্বর তোমাদের সম্মুখে দুটী আকর্ষণ রাখিয়া দিয়াছেন। যতই এই দুটী আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে, ততই স্বার্থপরতা কাটিয়া ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিবে। স্বার্থপরতা মনুষ্যকে আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে; কিন্তু এই দুটী আকর্ষণ তাহাকে আপনাকে ভুলিয়া যাইতে শিক্ষা দেয় এবং পরের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত করে। এই দুটী আকর্ষণের মধ্যে একটীর নাম প্রেম অথবা পরের সুখ লালসা, অন্যটী পুণ্যের লালসা অথবা পরের সেবাতে আমার পরিত্রাণ হয়, এই সত্যে বিশ্বাস।

* ব্রাহ্মিকা সমাজ—তৃতীয় উপদেশ। শুক্রবার, ২৯শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক।

স্বর্গের দিকে যাঁহারা চলিবেন, এই দুইটী তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিতেই হইবে। তোমরা বলিতে পার কেবল আপনার জন্য ভাব না, আপনার সুখ অন্বেষণ কর না, তাহা হইলেই কি স্বর্গে যাইবে? যেমন আপনার জন্য ভাব না, তেমনই অন্যের জন্য ভাবিতে হইবে; আপনার সম্বন্ধে বিষয়-বিরা,গ কিন্তু অন্যের কি রূপে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রতি অনুরাগ চাই। যিনি যথার্থ ভালবাসা কি বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি জানেন পরের দুঃখে অন্তরে কত দুঃখ হয়, এবং পরের সুখে মন কত সুখী হয়। ভাল বাসা কি? হৃদয়ের বেগ। যখন পাপী, পুণ্যবান্, কনিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, কদাকার সুন্দর ইত্যাদি জগতের সমুদয় লোকের প্রতি অনুরাগের বেগ আরম্ভ হয়, তখন কে তাহা থামাইতে পারে? সেই অনুরাগ, প্রথমতঃ যাহারা অত্যন্ত আপনার লোক তাঁহাদের মধ্যে বদ্ধ থাকে, ক্রমে তাহা পরিবারকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত পল্লীতে ব্যাপ্ত হয়, আবার পল্লী ছাড়িয়া সমস্ত নগরবাসী-দিগকে আলিঙ্গন করে, এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেশ এবং সমস্ত জগতে বিস্তারিত হয়। সেই প্রেম যাহা কিসে আপনার এবং আপনার পরিবারের ভাল হইবে চিন্তা করে, তাহাই কিসে সমস্ত দেশের অথবা সমস্ত পৃথিবীর নর নারী জ্ঞান এবং ধর্ম্মালোকে উন্নত হইবেন, সুখ রসে আস্বাদন করিবেন, তাহার জন্য ব্যস্ত হয়। এই প্রেমের উত্তেজনাতেই কেহ আপনার পরিবারের জন্য ভাবেন, কেহ আপনার দেশের জন্য ভাবেন, কেহবা কিসে সমস্ত পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য উপস্থিত হইবে এই জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন। কেহ কেহ আপনার বন্ধুদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসেন; কিন্তু যথার্থ প্রেম যাহা স্বর্গ হইতে আসিতেছে, তাহা শত্রু মিত্র সকলেরই কাছে যায়। কিসে শত্রুর ভাল হয়, যথার্থ প্রেমিক তাহা চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারেন না, অমুককে ভাল বাসা উচিত, অমুককে ভাল বাসা উচিত নহে, এই প্রকার ঔচিত্য মনে করিয়া কেহই যথার্থ প্রেম সাধন করিতে পারে না। উচিত বলিয়া যে কার্য্য কর তাহা এক প্রকার, এবং ভাল বাসিয়া যে কার্য্য কর তাহা আর এক প্রকার। যতদূর পরস্পরকে ভাল বাসা উচিত ব্রাহ্মিকা সমাজের ব্রাহ্মিকারা এখনও তাহা শিক্ষা করেন নাই। যাহারা অত্যন্ত আত্মীয়, এরূপ ২।৪ জনকে সকলেই ভাল বাসিতে পারে; কিন্তু সাধনের

বলে যে দিন তোমরা সমস্ত জগৎকে ভাল বাসিতে পারিবে সেই দিন বুঝিব যে তোমাদের হৃদয় স্বর্গীয় প্রেমের আধার হইয়াছে। ঈশ্বর হইতে যে প্রেমের বেগ আসিতেছে, তাহা হইতে কেহই বঞ্চিত হইতে পারে না। অত্যন্ত ভয়ানক শত্রু যে, সেই প্রেমে উন্মত্ত হইলে মনুষ্য তাহারও মঙ্গল কামনা করে; এবং সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাহার সেবা করে। যে ভালবাসা ঈশ্বর প্রেরণ করেন তাহার বেগ এত প্রবল এবং দুর্জ্জয়, যে মনুষ্য ইচ্ছা করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারে না। তখন সাধক ভাল বাসারূপ মহাসমুদ্রে ভাসিতে থাকেন। পরকে ভালবাসাই স্বর্গ। যে আপনাকে ভাল বাসিল সে মরিল, যে অপরকে ভাল বাসিল সে বাঁচিল। ভালবাসা পরায়ণ লোকেরা পৃথিবীর চারিদিকে পরের উপকার করিবার জন্য ধাবিত হইতেছেন, তাহাতেই এই জঙ্গল পূর্ণ পৃথিবী সুখের আলয় হইতেছে। ভালবাসা না থাকিলে কে পরের উপকার করিত? সকলেই আপনার আপনার জন্য ভাবিয়া মরিয়া যাইত। এই যে তোমরা সকলে মিলিয়া এখানে আসিতেছ, ভালবাসার জন্য। কেহ কাহাকেও ভাল না বাসিলে, একটী মাঠের মধ্যে জীবন যাপন করা যে কেমন দুঃখের ব্যাপার, পাছে তাহা তোমাদিগকে সহ্য করিতে হয়, এজন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে ভালবাসা দিয়াছেন। এই ভালবাসা আছে বলিয়াই পরস্পরের সেবা করিলে তোমাদের মনে আনন্দ হয়।

আর একটী আকর্ষণ, পরের সেবা করিলে পুণ্য হয় এই বিশ্বাস। অন্যের উপকার করিলে নিজের গুণ প্রকাশ করা হইল, অনেকে এরূপ মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন আমরা যদি দয়া না করিতাম, অমুক ব্যক্তি মরিত। পাছে এই অহঙ্কারে জগতের অধোগতি হয়, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের মনে আর একটী ভাব দিয়াছেন যে পরের সেবা করিলে যে পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইল তাহা নহে; কিন্তু পরসেবা না করিলে আমার নিজের পরিত্রাণ হয় না। ভাল বাসিয়া অন্যের সেবা করিলে জীবন পবিত্র হয়, ঈশ্বর এই বিশ্বাস না দিলে ভক্তেরা কখনই জগতের সেবা করিতেন না। অন্যের সেবা করিতে গিয়া তোমরা যদি মনে কর, তাঁহাদের প্রতি তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছ; কিম্বা তোমাদের আপনার

গুণ, অথবা আপনার হৃদয়ের উচ্চ ভাব দেখাইয়া তাঁহাদিগকে উন্নত করিতেছ, তাহা হইলে তোমাদের সেই অহঙ্কার জাত পরোপকার কখনই তোমাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। অনুগ্রহ প্রকাশ করা ধর্ম্ম নহে। কেবল বিনীতভাবে পরসেবা করিলেই আপনার পরিত্রাণ পথ পরিষ্কার হয়। হিন্দুরা মনে করেন উচ্চজাতি ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পুণ্য হয়। যখন তাঁহারা সেই সেবাতে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের সেবা করেন, তাঁহাদের রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য, এবং চরিত্র বিবেচনা করেন না; কিন্তু সে সকল ব্যক্তির সেবা করিলেই নিজের পুণ্য হইবে কেবল এই বিশ্বাসই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগকে ইহা শিখিতে হইবে। অনুগ্রহের ভাবে আমরা কাহারও সেবা করিব না। ক্ষুদ্র হইয়া যেমন মহতের সেবা করে আমরাও সেইরূপ আপনাদিগকে সামান্য এবং জঘন্য লোক বিশ্বাস করিয়া, ভাই ভগ্নীরা যতই কেন ক্ষুদ্র হউন না, বিনীত ভাবে তাঁহাদের সেবা করিব।

আমাদের শরীর শত শত পাপে কলঙ্কিত, মন অসাড় এবং নিতান্ত জঘন্য। কিন্তু পরসেবারূপ পুণ্যজলে আমাদের শরীর মনের মলিনতা দূর হইবে এই বিশ্বাস করিয়া আমরা যতটুক পরের কার্য্য করিব, তাহাতে যে কেবল এক্ষণেই আমাদের জীবন কৃতার্থ হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহা চিরকালের জন্য পরলোকের সম্বল হইয়া থাকিবে। অহঙ্কার হইতে যে পরোপকার, তাহা মনুষ্যকে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতে পারে না, এবং তাহাতে তাহার পুণ্যও হয় না। যাহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অনুগ্রহ করিতেছি বলিয়া পরোপকার করে, সেই সকল গর্ব্বিত ব্যক্তি, কদাচ ঈশ্বরের প্রেম-পরিবারের উপযুক্ত নহে। কিন্তু যাঁহারা বিশ্বাস করেন পরোপকার করিলেই জীবন পবিত্র হইবে, তাঁহারা যদি অতি সামান্য কার্য্যও করেন, তাহাতেও স্বর্গের পুণ্যে তাঁহাদের জীবন সুশোভিত হয়। এই সামান্য জঘন্য হস্ত দ্বারা যদি একটী ক্ষুদ্র ভাইয়ের সেবা করিতে পারি, এই মলিন জিহ্বা হইতে যদি একটী সুমিষ্ট কথা বাহির হইয়া একটী বিষণ্ণ আত্মাতে সুখ শান্তি বিস্তার করিতে পারে, যদি অন্যের জন্য একটী সাধু চিন্তা করি, তাহা হইলে জীবন সার্থক

হইবে এবং মৃত্যু সময়ে তাহা স্মরণ করিলে মনে আনন্দ হইবে। অতএব পরোপকার সামান্য মনে করিও না। পরকে ভাল বাসিলে স্বার্থপরতা চলিয়া যায়। যদি স্বার্থপরতারূপ নরক কুণ্ড হইতে বাহির হইয়া স্বর্গরাজ্যে যাইতে চাও, তবে এই দুইটী আকর্ষণ সম্বল কর। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিলে তোমরা শীঘ্রই তাঁহার প্রেম রাজ্যে উপনীত হইবে।

হে প্রেমময়! তোমার সিংহাসনতলে বসিয়া আমরা প্রর্থনা করিতেছি। আমরা বড় অহঙ্কারী, আমরা পরের ভাল করিতে গেলে ও অনুগ্রহ করি মনে করি। আমাদিগকে তোমার বিনীত দাস দাসী করিয়া লও। বিনয়ের ভিতরে কত আনন্দ সম্ভোগ করিব। হে পিতা! যদি আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে, স্বর্গের পবিত্র ভালবাসা আমাদের মস্তকে বর্ষণ কর। এই স্বার্থপর, নিষ্ঠুর মস্তকের উপর তোমার ভালবাসা দেখিতে দেখিতে পরসেবায় আপনার জীবনকে পুণ্যবান্ করিয়া কৃতার্থ হইব, এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগী মিলে ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র প্রেমময় চরণে বার বার প্রণাম করি।

স্ত্রী ও পুরুষ জাতির সম্বন্ধ।

আমাদিগের কোন প্রিয় বন্ধুর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক হইবে। তাঁহার দুইবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রথম সংসার গত হইলে, দ্বিতীয় বার; দ্বিতীয় পরিবারও গত হইয়াছে। তাঁহার এক বৃদ্ধা মাতা, আর প্রথম সংসারের দুইটী সন্তান বর্ত্তমান। তদ্ব্যতীত আর কেহ আত্মীয় নাই। সন্তান দুইটী মাতুলালয়ে বাস করে। বন্ধুবর বিবাহের জন্য উন্মত্ত হইলেন। আমরা নিবারণ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম। বন্ধুবর বলেন আমার কোন মতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। মাতাঠাকুরাণী, বয়স হেতু অপারগ, আমি একাকী কোন মতে চালাইতে পারি না। আমার সংসারের কাজ কর্ম্ম করে এমত একটী ও লোক নাই। দাসদাসী দ্বারা কোন মতে মনঃপূত হয় না। আমরা কহিলাম, সে সকলই সত্য, কিন্তু বিবেচনা কর, বন্ধুবর! তোমার বয়স

অধিক হইয়াছে, এবয়সে আবার দার পরিগ্রহ করা কোনমতে সাজে না। যাহাকে বিবাহ করিবে, ভাব দেখি তোমার অবর্ত্তমানে সেই কুলবালা তরুণীর কি দশা ঘটিবে? ইহার উত্তরে বন্ধুবর কহিলেন, তাহাতে কি, আমি ত আর মৃত্যুর পর দেখিতে আসিব না, কিন্তু এখন আমার করে কে? বন্ধুবর এই বিবেচনায় কৃতসংকল্প হইয়া সেই বৃদ্ধ বয়সে দার পরিগ্রহ করিলেন। অসঙ্গতি হেতু কোন গৃহস্থ কন্যার এগার বৎসরেও বিবাহ হয় নাই!! বন্ধুবর তাহারই পানি গ্রহণ করিলেন। আমাদিগের বন্ধুবরের ত বিষয় সম্পত্তি কিছুই নাই। কেবল চাকরীর স্বল্প বেতনের উপর নির্ভর।

এই প্রকারে, এইরূপ অবস্থায় আমাদিগের বন্ধুবরের বিবাহ হইল। বঙ্গসমাজে যে এই রূপ বিবাহ কত হইতেছে তাহা কে সংখ্যা করিবে? সেকালে যখন সকলেরই কিছু কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল; চাকরীর উপর নির্ভর ছিল না; ভূমিসম্পত্তি, ধান্য ও শস্য সকলেরই নিজ নিজ হস্তগত ছিল, তখনকার কালে মানুষের একরূপে জীবন যাত্রা চলিয়া যাইত। তখন ভাই ভগিনী আত্মীয় স্বজন দিগের মনের ভাব একপ্রকার ছিল, দশজনকে অন্ন দিতে পারা যাইত, দশজন অনায়াসে মোটামুটি প্রতিপালিত হইত। কিন্তু এখন সে কাল পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন নিজের বিষয় সম্পত্তি না থাকিলে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করা যে কতদূর অন্যায় ও অসঙ্গত তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। আমরা এই সকল কথা আমাদিগের প্রিয় বন্ধুবরকেও বলিয়াছিলাম। তিনি সকল কথারই একমাত্র উত্তর দেন আমার চলেনা, আমি গত হইলে, ফিরেত কিছু দেখিতে আসিব না।

এই রূপ স্বার্থপর বাক্যে বন্ধুবর আমাদিগকে প্রত্যুত্তর দেন। তিনি কেবল নিজ স্বার্থ বুঝেন, নিজ আবশ্যকতা বুঝেন। আপনার সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য তিনি বিবাহ করিলেন। যাহাকে বিবাহ করিলেন, তাহার বিষয় কিছুই বিবেচনা করিলেন না। অন্যান্য জাতীয় মনুষ্য সমাজে যে এ প্রকার স্বার্থপর বিবাহ সম্পন্ন হয় না এমত নহে। কিন্তু অন্যান্য দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। স্ত্রীজাতি একেবারে নিরুপায় নহে। এ দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে এখানে বিবাহ

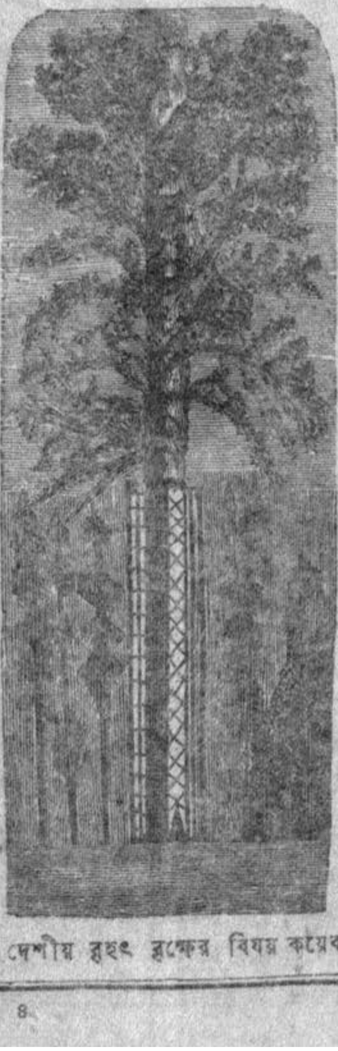
প্রসঙ্গটী একটী নূতনভাব ধারণ করিয়াছে। দার পরিগ্রহ করিতে হইলে হিন্দুর পক্ষে যত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, এমন আর কোন জাতিরই নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই বিবাহ করিতে আমাদিগের কোন ভাবনাই হয় না। সকল বিষয়েই বিবেচনা করি, বিবাহ করিতে কোন বিবেচনা করি না। উক্ত বন্ধুবরের প্রত্যুত্তরে প্রতীত হইতেছে, আমরা কিরূপ প্রয়োজনে আমাদিগের স্ত্রীজাতিকে নিয়োজিত করিয়া থাকি। আমরা বিবেচনা করি, কেবল আমাদিগের সেবার জন্যই তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষ জাতির সম্বন্ধ এই রূপ নীচভাবে পরিপূর্ণ। কিন্তু অবলা নিরক্ষরা স্ত্রীজাতি, সেই পুরুষ জাতির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছে। তাহাদিগের এমত জ্ঞান নাই, যে নিজ, ও পরস্বার্থ বুঝিয়া লয়। বিষময় শয্যায় তাহারা নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইতেছে। স্বার্থপর পুরুষজাতির কথায় তাহাদিগের অণুমাত্র অবিশ্বাস নাই, তাহাদিগের উপদেশ অলঙ্ঘনীয়।

স্ত্রীজাতির সহিত পুরুষজাতির এই রূপ সম্বন্ধ যে কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত আছে অন্য দেশে নাই, আমরা এপ্রকার কথা বলিতে চাহি না। পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বসমাজেই ন্যূনাধিকরূপে এই ভাব বিরাজমান দেখা যায়। স্ত্রীজাতির জ্ঞানোন্নতি সাধন করা আমাদিগের নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাহাদিগের জ্ঞানোন্নতি সাধিত হইলে সামাজিক ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। তখন মনুষ্য সমাজে নিশ্চয়ই নূতন ও উৎকৃষ্টতর ব্যবহার প্রণালী সংস্থাপিত হইবে।

এক্ষণকার স্ত্রী এবং পুরুষজাতির সম্বন্ধীয় নৈতিক সমাজ যে নিশ্চয় ভ্রমসঙ্কুল, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। স্ত্রীজাতিকে অধীন বিবেচনায় পুরুষজাতি যে সমস্ত স্বার্থপর ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্যবস্থা মতে উভয় জাতীয় সম্বন্ধ এক্ষণে নিরূপিত ও পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু স্ত্রীজাতি যখন স্বাধীনভাব ধারণ করিবে, এবং সেই ভাবে যখন পুরুষজাতির ব্যবস্থা সকল পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইবে, তখন যে মানবীয় নৈতিক সমাজের কি গণ্ডগোল ঘটিবে কে বলিতে পারে? যে ব্যবস্থা কেবল স্বার্থের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, সে ব্যবস্থা কখন ধর্ম্মবৈধ হইতে

পারে না। অতএব এখন হইতে পুরুষ জাতি স্ত্রী জাতির প্রতি নিঃস্বার্থ ব্যবহার অভ্যাস করিলে ভবিষ্যতে সামাজিক গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না।

ঐরাবত বৃক্ষ।



আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বৃহৎ বৃক্ষের বিষয় কয়েক বার লিখিয়াছি।

আফ্রিকার যেওবাব, কানারী দ্বীপের শতশীর্ষ বৃক্ষ অদ্ভুত পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। আমরা এ দেশের বটকে যেমন বৃক্ষরাজ বলি, সেই সেই দেশে উক্ত তরুসকল বৃক্ষরাজ বলিয়া পূজ্য। যাহাহউক বৃক্ষ রাজ্যের সংখ্যা আমরা যাহা মনে করিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অধিক দেখিতেছি। দিন দিন আশ্চর্য্য পদার্থ সকল নূতন আবিষ্কৃত হইতেছে, কালে আরো কত হইবে কে বলিতে পারে?

আমরা এই প্রস্তাবে যে ছবিটী অঙ্কিত করিয়াছি, ইহাকে ইংরাজীতে ম্যামথ বা ঐরাবত বৃক্ষ বলে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম কালিফর্ণিয়া উপদ্বীপে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ইহা দেখিয়াছেন বলেন, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সে সকলের অপেক্ষা উচ্চতা ও পরিধিতে বৃহত্তর।

লব নামক একজন ইংরাজ পর্য্যটক ও প্রাকৃতিক ইতিবেত্তা সীরানিবেডা নামক স্থানে ইহা প্রথম দর্শন করেন। ষ্টানিসলস্ ও সান আণ্টোনীয় নদী তটে সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৪৫৯০ ফিট উচ্চে ইহার মূল দৃষ্ট হয়। ইহা দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ, সচরাচর ২৫০।৩০০ ফিট এবং কখন কখন ৪০০ ফিট উচ্চও হইয়া থাকে। ইহার ছালের রঙ দারুচিনির ন্যায় এবং তাহা ১২ হইতে ১৮ বুরুল পুরু। ইহার কাষ্ঠের বর্ণ রক্তিম। ইহার গুঁড়ির পরিধি ১০ হইতে ২০ ফিট। ইহার শাখাবলী গুঁড়ি হইতে চারিপার্শ্বে সরল ভাবে প্রসারিত হয়। বৃক্ষের আয়তন অতি বৃহৎ হইলেও ইহার শিখাগ্র ২॥ বুরুল মাত্র। এই বৃক্ষের বার্ষিক বৃদ্ধি পরিমাণ গণনা করিয়া দেখিলে ইহার বয়ঃক্রম ৩।৪ হাজার বৎসর বোধ হয়। এক একটী বৃক্ষ এতদপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

লোকেরা কৌতুক বা ধনলাভোদ্দেশে অনেক গুলি ঐরাবত বৃক্ষ ধ্বংস করিয়াছে। ইউনাইটেড ষ্টেট্স গবর্ণমেণ্ট ইহার একটী বৃক্ষচ্ছেদনের বিবরণ প্রকাশ করেন। ৫ জন বলিষ্ঠ ব্যক্তি ২২ দিনে তাহার শরীর ছিদ্র করে এবং আরো ২ দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া তাহার মধ্যে গোঁজ পুতিয়া দেয়। তৎপরে ছিন্ন অংশ একদিকে ঝুঁকিয়া ধরাশায়ী হয়। এই গাছটী উচ্চে ৩০২ ফিট এবং ভূমির উপর পরিধিতে ৯৬ ফিট। একটী ঐরাবত বৃক্ষের গুঁড়ির

নিম্নভাগের একখানি ছাল ছাড়াইয়া সান্ ফ্রান্ সিস্কোতে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা যুড়িয়া গোলাকার করিয়া রাখিলে একটী গৃহের ন্যায় হইল, তন্মধ্যে কার্পেট পাতিয়া ৪০ জন লোক একটী পায়েনো যন্ত্রের সহিত অনায়াসে উপবেশন করিল।

আমরা যে বৃক্ষটীর চিত্র অঙ্কিত করিলাম, ইহার নাম ফাদার অব দি ফরেষ্ট অর্থাৎ বনস্পতি ছিল, ইহার মস্তক অনেক দিন হইল ছেদিত হইয়াছে। ইহার শরীরে ১৬০ ফিট পর্য্যন্ত ছাল ছাড়াইয়া লওয়া হয়, তাহা ১৮ বুরুল পুরু, ইহা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত সিডেনহামের ক্রিষ্টাল প্যালেসে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে ১৮৬৬ সালে আগুণ লাগিয়া পুড়িয়া যায়।

বৃহদাকার বৃক্ষ সকল নদীতীরস্থ ভূমিতে দুই তিনটা একত্র ঝাড় হইয়া উৎপন্ন হয়। কালিফর্ণিয়াতে এই জাতীয় প্রায় ৫০০ বৃক্ষ ২০০ বিঘা ভূমি অধিকার করিয়াছে, তন্মধ্যে ৮০।৯০ টা বৃহদাকৃতি।

যেখানে এই বৃক্ষ সকল আছে, তাহার নিকটে কালিফর্ণিয়ার স্বর্ণের খনি হইতে স্বর্ণ উদ্ধারের জন্য খনকেরা আসিয়া থাকে। তাহারা অনেক সময় এই বৃক্ষের কোটরে বাস করে। 'খনকাবাস' নামে একটী গাছ আছে, তাহার ভিতর ফাঁপা, ইহা প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ। ইহাতে যে গহ্বর আছে তাহার পরিসর ১৭ফিট এবং বেড় প্রায় ৫০ফিট। একটী মূল হইতে ৩টী ঐরাবত বৃক্ষ জন্মিয়াছে, তাহাদিগের নাম ভগিনীত্রয়। ইহাদের একত্র পরিধি ৯০ এবং উচ্চতা ২৯০ ফিট। আরোহণ শিক্ষালয় নামে একটী শূন্যগর্ভ বৃক্ষ আছে, তাহা ঝড়ে ভূপতিত হইয়াছে, তাহার উপর ৭০ফিট পর্য্যন্ত অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অনায়াসে গমন করা যায়।

ইংলণ্ডের ধনী লোকেরা স্ব স্ব উদ্যানে ঐরাবত বৃক্ষ সকল রোপণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক গুলি বৃহদাকার হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের বৃদ্ধি অতি মন্দগতিতে হইয়া থাকে, যাহা হউক কালে যে ইহারা কালিফর্ণিয়ার বৃহৎ বৃক্ষের সমকক্ষ হইবে এরূপ আশা পাওয়া যাইতেছে।

গঙ্গা ও গঙ্গার খাল।

গত সংখ্যক পত্রিকায় গঙ্গার উৎপত্তি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল পুরাণের কথা স্থগিত থাকুক। এইক্ষণে যাহা চক্ষে দেখা গিয়াছে, জাহ্নবীর উৎপত্তি আদি বিষয়ে যাহা প্রাকৃতিক ও বিশ্বসনীয়, তাহারই অনুসরণ করা যাইতেছে।

এই মহানদী গঙ্গা প্রস্রবণ-সম্ভূত। গিরি-নিঃসৃত জল স্রোতকে প্রস্রবণ কিম্বা নির্ঝর বলে। ইহা নিসর্গ-জাত। আমাদের অধিষ্ঠান ভূমি ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় উত্তুঙ্গ হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় বিদ্যমান। এই মহা শৈলের শিলাময় গাত্র ভেদ করিয়া শত২ প্রস্রবণ বিনির্গত হইয়াছে। নির্ঝর সুদূরগামী বৃহৎ হইলেই নদী আখ্যা ধারণ করে। একটি প্রবল প্রস্রবণ বা ২।৩টী কি ততোধিক ক্ষুদ্র২ প্রস্রবণ মিলিত হইয়াই নদীর আকার হয়। যে স্থানে হিমাচল হইতে যমুনা নদী বাহির হইয়াছে, তাহার অনতিদূরে পূর্ব্বভাগে গঙ্গার উৎপত্তি স্থান। আকাশ কুজ্ঝটিকা নির্ম্মুক্ত থাকিলে উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে হিমাচল শৃঙ্গ মসুরী হইতে গিরি পাদ মূলে বামে দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদী সংলক্ষিত হইয়া থাকে। হরদ্বারের প্রায় ২ ক্রোশ উত্তরে ভীমগড়া নামক স্থানে হিমালয়ের ৭টী ভিন্ন২ প্রস্রবণ আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই একীভূত সপ্ত নির্ঝর মহাবেগে নিম্ন ভূমিতে আসিয়া অন্য২ জল স্রোত নদীর যোগে বৃহদায়তন হইয়া সাগরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, এই জল প্রবাহের নামই গঙ্গা। হরদ্বারের প্রায় ৪ক্রোশ দূরে তপোবন নামে হিমালয়ের একটী রমণীয় উপত্যকা ভূমি আছে, সেখানে অনেক গুলি যোগী সন্ন্যাসী বাস করে। তথায় যাইতে রজ্জু সেতু যোগে গঙ্গা পার হইতে হয়। এই দড়ির পোল্‌টীর নাম লক্ষ্মণ ঝোলা। হরদ্বারের নিকটে গঙ্গার পরিসর কলিকাতার ভাগীরথীর পরিসরের চতুর্থাংশ তুল্যও হয় কিনা সন্দেহ। গভীরতা কোন স্থানেই ১০।১২ ফিটের অধিক হইবে না। কিন্তু অত্যন্ত প্রখর স্রোত। জলে নামিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকা যায়না। হরদ্বারের প্রান্তবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যানী ভেদ করিয়া ক্রোশাধিক পথ দূর হইতেই এই জল প্রবাহের কল২ ধ্বনি

ক্ষুতি বিবরে প্রবেশ করে। জল বরফের ন্যায় শীতল, কিন্তু কাচবৎ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। জল গর্ভে নানা বর্ণের রাশি২ শিলাখণ্ড পতিত আছে, প্রস্তর সকলের বর্ণাভায় গঙ্গাসলিলও বিবিধ বর্ণ ধারণ করিয়া নানা স্থানে বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে। কোন কোন স্থানে বড় বড় কচ্ছপ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।

হরদ্বার একটী উপনগর, উহা গঙ্গার পশ্চিম কূলে বিস্তৃত। এটী হিন্দু জাতির পবিত্র তীর্থ। এখানে অনেক গুলি দেবালয় আছে। ব্রহ্মকুণ্ড, কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি কয়েকটী বিখ্যাত গঙ্গার ঘাটে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্নান শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে বিশেষতঃ কুম্ভযোগে হরদ্বারে মহা-সমারোহের স্নান মেলা হয় এবং মাসাধিক কাল ব্যাপিয়া এই মেলা থাকে। এখানে অনেক শত অর্থগৃধ্নু পাণ্ডা আছে। কলিকাতা হইতে গঙ্গামূল কি হরদ্বার দর্শনে যাইতে হইলে সাহারণপুর নগরে রেইল হইতে নামিতে হয়, তথাহইতে হরদ্বার উত্তর পূর্ব্বকোণে ৩৫।৩৬ মাইল দূরে। বাষ্পীয় শকট যোগে ৩দিনে সাহারণ পুরে উপস্থিত হওয়া যায়। ধন্য তাঁহার দয়া ও পালনী শক্তি, যিনি অগণ্য জীব জন্তুর পিপাসা শান্তি ও ধরণীকে শস্য-শালিনী করিবার জন্য দুর্ভেদ্য শিলাভেদ করিয়া অবিশ্রান্ত নির্ম্মল বারি-প্রবাহ বাহির করিতেছেন, ভাগীরথীর সৃষ্টি করিয়া শত২ ক্রোশের লক্ষ২ জীবের জীবন রক্ষা ও স্বাস্থ্য সুখ সম্বর্দ্ধন করিতেছেন।

বিখ্যাত গঙ্গার খাল্ বা কেনাল মগরা হইতে আরম্ভ হইয়া পাঁচশত মাইল অতিক্রমপূর্ব্বক কাণপুর নগরে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর রূপ মহাদেবের বরে, বিলাতী যন্ত্র রূপ ঐরাবতের সাহায্যে, ভগীরথ রূপী ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা কলিযুগে এই গঙ্গা বাহির হইয়াছে। পুরাণের মতে সত্য যুগের গঙ্গা পাপী বৃন্দকে উদ্ধার করিতেছেন, কিন্তু এই কলির গঙ্গা দুর্ভিক্ষ জনিত মৃত্যু হইতে লোক সকলকে বাঁচাইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। এই খালটী কাটাইতে গবর্ণমেণ্টের ২কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। মূল কেনালের শত২ শাখা প্রশাখা নানা দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। লক্ষ২ লোকের জলাভাব মোচন করিতেছে। ভারতবর্ষে এটী অতি প্রসিদ্ধ জল প্রণালী। ইহাতে

ইঞ্জিনিয়ার দিগের প্রভূত বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ পাইয়াছে। কেনাল হরদ্বারের ১৫ মাইল দক্ষিণ রুড়কী নগরের উপর দিয়া চালিত হইয়াছে। এই ১৫ মাইল স্থান অত্যন্ত বন্ধুর। কোন স্থানে জল প্রপাতের ন্যায় কেনালের জল পুঞ্জ উচ্চ ভূমি হইতে গভীর গর্জ্জনে নিপতিত হইতেছে, কোথায় বা ভূমির নিম্ন দিয়া প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য যে এমতাবস্থায় ও প্রণালীতে নৌকায় গতি বিধি হইতেছে। এস্থানে জিজ্ঞাসা এই হইতে পারে যে যেখানে জলসীমা এরূপ অসমতল, সেখানে নৌকা কিরূপে চলে, নিম্ন হইতে নৌকা কিপ্রকারে উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করে? ইহার কৌশল আছে। যে খানে প্রণালীর এরূপ অবস্থা, সেখানে উপরি ও নীচে পাশাপাশী প্রাচীর এবং কবাট আছে, মনে কর একখানা নৌকা নীচ হইতে উপরে যাইবে, ঐনৌকা নীচের দ্বার ছাড়িয়া আসিবা মাত্র উক্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, তাহাতে জল স্রোতঃ সরিয়া যাইবার পথ নাপাইয়া সেখানে আটক হইল, অত্যল্প সময়ের মধ্যেই জল সীমা উচ্চ হইয়া নৌকা খানাকে উর্দ্ধে উঠাইল, যখন প্রবাহ সমতলতা প্রাপ্ত হইল, তখন নৌকা উপরের দ্বার পার হইয়া চলিয়া গেল। অতঃপর নীচের কপাট খুলিয়া দিল, জল হুংশব্দে বেগে ধাবমান হইল। রুড়কি নগরের উত্তর প্রান্তে একটী নদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, কেনাল উচ্চ ভূমির উপর দিয়া দক্ষিণ দিকে চালিত হইয়াছে। উক্ত নদীর সহিত কেনালের যোগ হইলে তাহার প্রবাহ নদীর প্রবাহের সঙ্গে মিলিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কেনালের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এই বিঘ্ন নিবারণের জন্য নদীর উপরে একটী লৌহসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুর উভয় প্রান্ত লৌহময় প্রাচীরে বদ্ধ। এই সেতু দিয়া প্রণালীর জল-প্রবাহ চালিত হইয়াছে। এখানে ২টী প্রবল জল স্রোতের ক্রস (চতুস্পথাকারে মেলন) চমৎকার দৃশ্য। রুড়কি নগরটী উক্ত প্রণালী ও তাহার শাখা প্রণালী দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তথায় কেনালের উভয় কূলসোপান শ্রেণীতে বদ্ধ। কেনালের জলের গভীরতা ১০ফুটের অধিক হইবে না। পরিসর ২৫ফুট হইতে পারে। নগরী বক্ষে প্রণালীর উপরি যেখানে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তথায় দুই পারে ২টী সিংহের বিশাল প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। রুড়কিতে কেনাল সক্রান্ত একটী ইঞ্জিনিয়ারিং আফিস আছে।

নূতন সংবাদ।

১। আমাদিগের পাটকগণের স্মরণ আছে, কয়েক বৎসর হইল ঢাকা অঞ্চলের কুলীন কন্যা কুমারী বিধুমুখী কৌলীন্য প্রথামতে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হয় কয়েক জন আত্মীয়ের সাহায্যে কলিকাতায় আনীত হন এবং হাই কোর্টের মোকর্দ্দমায় বয়ঃ প্রাপ্ত সপ্রমাণ হইয়া স্বাধীন ইচ্ছামতে থাকিবার অনুমতি পান। এত দিনের পর। ২৭ বৈশাখ শনিবার বাবু রজনীনাথ রায় এম এর সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মতে ইহাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভবানীপুরে হাই কোর্টের উকীল বাবু দুর্গামোহন দাসের ভবনে মহা সমারোহে এই বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বিবাহটী যথাযোগ্য হইয়াছে। বিধুমুখীর ভাগ্যে একটু জ্ঞানযোগ হইয়াছিল, তাই তিনি বহুবিবাহকারী বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অতি উৎকৃষ্ট বরের সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইলেন, এক আপনার সর্ব্বাধীন উন্নতির পথ লাভ করিলেন।

৩। ডাক্তর হে এসকুইমোদিগের বিবাহ প্রণালী এই রূপে বর্ণন করিয়াছেন—বর কন্যার পিতা মাতা প্রথমে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। পরে বরকে একটী শ্বেত ভল্লুক শিকার করিয়া আনিতে হয়, তাহাতে তাঁহার বল এবং পুরুষার্থের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপরে ইচ্ছা করিলে তিনি বিবাহ করিতে পারেন, এই রূপ বলা হয়। আইবড় পুরুষেরা প্রায়ই বিবাহেচ্ছু হয়। তৎপরে তিনি কন্যার গৃহদ্বারের পশ্চাতে লুকাইয়া থাকেন এবং কন্যা বাহির হইয়া আসিলে তাহাকে কসিয়া ধরেন এবং তাহাকে তাহার কুকুর টানা গাড়ীতে যুথিবার চেষ্টা পান। কন্যা পদাঘাত করে কামড়ায়, চিৎকার করে এবং তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া যায়। বর তাহাকে তাড়া করেন, তত্রত্য বৃদ্ধা রমণীরা বরফাসিক্ত সিল মাছের চামড়া লইয়া তাহাকে আঘাত করিতে থাকেন। এই স্ত্রীলোকদিগের আঘাত খাইতে খাইতে কন্যাটী ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়ে। বর তাহাকে তখন ধরিয়া লইয়া চক্রহীন গাড়িতে যুথিয়া দেন, এবং কুকুরদিগের পৃষ্ঠে চাবুক মারিলে তাহারা বরফের উপর বেগে দৌড়িতে থাকে। ইহা হইলেই শুভ বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বামাগণের রচনা।

নূতন বর্ষ।

এস এস বর্ষ রাজ, ধরায় কর বিরাজ,
নূতন ভাবেতে আজ, নিজ কাজ কর হে।
গতহল পুরাতন, ছিলবটে আলাপন,
তোমায় করে অর্পণ, হল দেহান্তর হে।
হতেছ নূতন রাজা, কেমনে পালিবে প্রজা
যাবে সব বোঝা সোজা, দিনকত পরে হে।
সথা হে জানি তোমার, ভাল মন্দ ব্যবহার,
বিদায় দিতে আমার, মন নাহি সরে হে।
তব মন জানিয়াছি, তুলে তুলে লইয়াছি,
তাহাতেই পাইয়াছি, তার পরিচয় হে।
তব রাজ্যে যেইজন, হয়ে অন্ধের মতন,
বৃথা করেছে হরণ, সেই দুঃখ সয় হে।
তার আশা মনেং, নূতনের সংমিলনে
নূতন রাজার সনে খুলিব হৃদয় হে।
কিন্তু কিছু পরে হায়, তোমার মতন প্রায়,
পুরাতন হলে নায়, মন নাহি চায় হে।
কেহ তব যশ ঘোষে, কেহবা সদাই রোষে,
কেহবা সদাই দোষে, বলি কাল কাল হে।
কিন্তু আমি মনে জানি, কালের নিয়ন্তা যিনি
কভু কি বাসেন তিনি বৃথা কাল ভাল হে।
কালেতেই হয় জ্ঞানী কালেতেই হয় মানী
কালেতে সুখের কাল, সকলেই পায় হে।
সেই কাল বয়ে যায়, কর তার সদুপায়,
ফিরে পুনরায় তায় পাবেনাকো আর হে।
যাঁহার প্রসাদ লয়ে, এসেছিলে এআলয়ে,
তাঁহার নিকটে গিয়ে, একথা শুধাও হে।
তব প্রতি যেই জন, সুখে ছিল প্রতিক্ষণ,
তাহার প্রতি এখন করুণা বিলাও হে।

জগদ্দলস্থ হিন্দুমহিলা।

86

THE BAMABODHINI PATRIKA.

(From a Lady in England.)

HAVING been told that descriptions of English manners and customs would be interesting to your readers I will try to make some. I fear that in my ignorance of your customs I may leave unexplained some things which are new and strange to your readers, or give minute accounts of other things which are as familiar in India as in England, but I can only do my best.

An evening party in London would be a strange sight to any woman who had passed her life in Indian seclusion. Let us imagine ourselves, at about nine o'clock in the evening set down by a cab at the door of a gentleman's house from whom we have received an invitation. No sooner is the door opened than we hear the sound of many voices, but at a distance, for the party is assembled in the drawing room, which is usually up one flight of stairs. We are shown first into some small room, (the library perhaps, or if there are children in the house it may be the school room,) to take off our shawls and arrange our dress after our crowded drive in the cab. The gentlemen leave their hats in the entrance hall, and as in the present fashion one hat is so very like another that it is hard for any man to recognize his own without careful examination, each has a paper ticket put on it by a servant. The tickets are numbered, and the servant hands a smilar ticket to the owner of the hat, and by showing this he is able to get his own property again when he wishes for it. Having arranged these matters we go into the dining room, where tea and coffee are set out on a table. We drink a cup standing, and without staying long we go on to the drawing room, from which the buzz of voices has been proceeding ever since we came into the house. The servant announces our names in a loud voice as he opens the door of the room, and our host and hostess come forward to shake hands with us. They have not time to say many words to us before their attention is claimed by a fresh arrival and we have leisure to look about us. The room is full—perhaps sixty or eighty people or more are present,—and all the furniture has been moved out or packed away in the smallest possible space, except the piano and some seats placed against the walls. These seats are usually full, and the greater number of people have to stand. As we are strangers we find few people to talk to, for it is not the custom to address a stranger without an introduction, and we find our chief amusement in watching the company. The ladies are dressed in bright coloured silks, or light gauzy materials, with flowers in their hair. The gentlemen without one exception are in black cloth coats with white neck-ties. Their dress certainly does not add to the brightness of the room, but the light from the chandelier, or lamp rung from the middle of the ceiling, is strong enough to make the room as a whole look tolerably

brilliant, in spite of the black coats. Presently a lady goes to the piano, and plays, but the company does not apparently care much for music. They even seem to talk louder than before, as if to drown it. But the case is differents if any one begins to sing. It would be thought bad manners to drown the singer's voice, and the talking stops till the song is ended. Now our hostess remembers that we are strangers, and therefore in need of her hospitable attentions, so she "introduces" us to one or two of her guests. This introduction is rather an absurd thing, for though one can generally catch the sound of one's own name it is not often that one hears that of the stranger, and it is not easy to find an appropriate subject of conversation with a person about whom one is in utter ignoranse, while he is probably in equal ignorance about oneself. The weather usually suggests itself as a safe topic of conversation, one that can hurt no one's feelings, and it is to be hoped that when the first shyness is over (or as we say here "when once the ice is broken") something rather more interesting may take the place of rain or snow or sunshine.

Now it is getting near eleven o'clock and our hostess is pairing off the company, introducing a gentleman to each lady, to go down to supper. If there are fewer gentlemen than ladies some of them have to do duty twice over, but supper is not a long business. Every one has dined late, and there is little eating or drinking beyond an ice or a plate of jelly, with a glass of wine or lemonade. Parties such as this may not be very entertaining or improving, may not be conducive to rational conversation, or lead to the formation o... pleasant friendships, but even those who think them dull and a waste of time can hardly accuse them of doing mischief in the matter of drink.

But the clock warns us that it is near twelve o'clock. We find our shawls, get a servant to fetch us a cab, and shaking hands with our hostess we take our departure, thinking that a few such parties may be amusing enough, but that one might easily have more than enough of close crowded rooms, noisy with many voices.

CHILD LIFE IN ENGLAND.

II.

We have described the way in which children's birth-days are kept. Christmas is even a greater event, for it is kept as if it were every body's birth-day at once. Though a religious festival in its origin it is now more of a social holiday than anything else,—a time when every body gives presents to their friends, when the busiest have some holiday, and the poorest provide better cheer than usual, when absent members of a family do their very best to come home if only for a short visit, and when festivities of some sort take place in all charitable institutions, down to the dreary workhouses which the law provides as a refuge for the poorest poor.

Of course a time like this is looked forward to by children for weeks before hand. There is much mysterious contriving of presents, which are to be kept quite secret from the recipients till the great day comes, and the Mother is expected to pretend blindness, or, at all events, to ask no questions, if she catches a glimpse of a half finished pincushion, or an undirected parcel which she cannot account for.

A few days before Christmas Day the school-boys and school-girls come home. They have been away perhaps five months, and the affectionate greetings, the excitement, the noise and life and merriment with which the house is filled may be better imagined than described. On Christmas Eve they employ themselves in decorating the house with wreaths and bunches of "evergreens," as we call the few plants that do not drop their leaves in autumn. Among them the holly is conspicuous by its bright shining leaves, with stiff thorny points to them, and its rich red berries.

Let us hope that Christmas Day when it comes is a bright day, frosty but not too cold, for much of the children's enjoyment will be spoiled if it rains. As the family meet for breakfast there is general greeting of "A merry Christmas to you." There is the Christmas number of some periodical to be looked at, and perhaps a large extra picture with it to be put up against the wall. Then it is time for church or chapel, for it is a common though not universal custom to attend public worship on the morning of Christmas Day. The church is decked out with wreaths of green, so that the service itself has a festive character, and the afternoon is spent in games and amusements, unlike the afternoon of an ordinary Sunday. Sunday is apt to be a day of restraint to children, though not without its own enjoyments, and they prize doubly a day like this which gives them Sunday privileges without the accompanying restraints. There are no lessons to do, the Father is athome from business, and yet shouting and noisy play are not forbidden. If the ice is strong enough the boys go out to slide and skate, the bolder spirits among their sisters following them. Or they go a long walk into the country with their Father. Or there may be gifts to take to some old servant or poor neighbour. We are still a long way from practising the spirit of the oldest and grandest of Christmas hymns, which will be read in almost every place of worship throughout the land, "Glory to God in the highest, on earth peace, good will to men." But we must acknowledge that some attempt is made to realise it, when we see how universally the poor are remembered at this season of rejoicing. I am describing the doings of well-to-do middle class families, but the holiday making, the meeting of old friends, the sprigs of holly and general merriment are not peculiar to any class.

But the short winter day is drawing to a close, and the family assemble round the bright fire. The dinner has been made a little earlier than usual, that the young ones may have the honor of joining with their elders, and the

whole party sit down to table together. There are certain regular Christmas dishes, some of which are sure to be found on the table. Roast meat, either turkey, goose, or beef, to begin with, and they national "plum pudding" to end with.

Then probably comes the Christmas Tree, though this is often put off till another day for the sake of getting together a larger party of children than can be spared from their own homes on the important day. It is a German custom introduced into England only about 20 or 30 years ago, but now very general here. A small healthy fir-tree is planted in a pot. I have seen unpretending little trees so small that I could have carried them in one hand, and I have seen trees as large as could be conveniently brought in at the door. Wax-tapers are fastened to the twigs, and little colored lamps, together with oranges, sweet meats, dolls and ornaments of glittering tinsel, while more substantial gifts are piled in a heap at the bottom. The mother has been preparing this for some days, in a room with closed doors, and the children have given their contributions into her hands to fasten on the tree. Now she slips away while they are busy over some game, lights all the lamps and candles, throws open the doors, and the children's first sight of the tree is a dazzling one indeed. They do not make much noise at first. They are too busy staring in astonished admiration. When this first astonishment has passed away we must take care that they do not press too closely round the candles, while we dismantle the tree, lest their thin dresses should catch fire. By the time all the presents are distributed the candles have burnt down and we find a damp sponge on a stick very useful as the tree catches fire here and there from an expiring taper. As the glory of the tree departs, the younger children are carried off to bed, leaving the elder ones to finish the evening more quietly.

(Remembering how very ignorant of Indian customs we English ladies are, and that Indian ladies are not likely to be much better informed about English customs, I had better add a word of explanation about Christmas. It is a festival in memory of the birth of Christ. We usually speak of it as if it were the anniversary of that event, but in fact the exact year in which it took place is not known, much less the time of year. The festival has at different times been held at different seasons, but the greater part of Christendom has finally fixed on the 25th of December as Christmas day, and the remaining part celebrates the festival within a few weeks of that time. This has now been the case for many hundreds of years, so that comparatively few people are aware that any doubt or uncertainty exists as to the time of year when the birth of Christ might most correctly be celebrated.)

No 130 ৪৪ May 1874

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৩০ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ম ভাগ

সূচী।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভার সাহায্যে
ভারত সংস্কার সভান্তর্গত
বামাকুলোন্নতি বিভাগ হইতে
প্রকাশিত।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়—কলিকাতা মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
১৩ সংখ্যক ভবন।

মূল্য ।০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

১। মফঃস্বলস্থ নূতন গ্রাহক দিগের নিকট হইতে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত না হইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।

২। বাকী মূল্য প্রদান করিতে একমাসের অধিক বিলম্ব হইলে মফঃস্বলের পত্রিকা বন্ধ হইবে।

৩। প্রথম ৩।৪ মাসের মধ্যে বার্ষিক অগ্রিম মূল্য প্রদত্ত না হইলে প্রতি খণ্ডের হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

৪। ষাণ্মাসিকের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না এবং বৈশাখ হইতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ষাণ্মাসিকের এই দুই মাত্র সময় থাকিবে।

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতার জন্য	২।০
মফঃস্বলের (ডাকমাশুল সমেত)	২॥৴

অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য।

কলিকাতার জন্য	১৷৹
মফঃস্বলের (ডাকমাশুল সমেত)	১।৴০
প্রতিখণ্ডের মূল্য ...	।০
এককালে ১২ খণ্ডেরমূল্য ...	২।০

মফঃস্বলস্থ যে সকল গ্রাহকের নিকট হইতে ১২৮০ সালের অগ্রিম মূল্য অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাহাদিগের প্রত্যেককে এক২ খানি পত্র লেখা গিয়াছে অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত শীঘ্র২ টাকা পাঠাইলে বাধিত হইব। নচেৎ পুনর্ব্বার পত্র লিখিতে গেলে বামাবোধিনীকে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। দেখিবেন এবিষয়ে ঔদাস্য না করেন।

বাঃ বোঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৩০ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ম ভাগ

জ্ঞান জগৎ।

"———What; if man were none,
Should heaven want spectators, God want praise!"

কি ক্ষতি, মানব যদি না হতো সৃজন,
অভাব কি দর্শকের দেখিতে গগন!
অভাব কি ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন!

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে জড় জগৎ যে প্রকার আশ্চর্য্য নিয়মে ও অদ্ভুত কৌশলে পরিচালিত হইতেছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে মন অপার আনন্দ রসে প্লাবিত হইয়া যায়। এই জড় জগৎ মধ্যে আবার যে প্রাণীজগৎ অবস্থিতি করিতেছে, সেই প্রাণীজগতের ব্যাপার অধিকতর আশ্চর্য্য নিয়মে ও কৌশলে সম্পন্ন হইতেছে। জড় জগতে ঈশ্বরের যে অসীম জ্ঞান, অসীম শক্তি ও অসীম প্রীতির আভাস মাত্র পাই, প্রাণী জগতে তাহার উজ্জ্বল আলোক দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া যাই।

যখন আমরা আমাদিগের সন্নিকটস্থ পদার্থ সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ ও অণুবীক্ষণ সহকারে পরীক্ষণ করিয়া দেখি, জড় জগৎ মধ্যে আমরা এমত কোন পদার্থ দেখিতে পাই না, যাহা অসংখ্য প্রাণীর আবাস ভূমি হয় নাই। প্রতি জলকণায়, প্রতি বৃক্ষপত্রে প্রতি বিন্দুমাত্র পদার্থে সহস্র সহস্র প্রাণী বিচরণ ও

কেলী করিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণীগণের গাত্রও জীবশূন্য নহে। অণুবীক্ষণ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখ,প্রতি স্থূলকায় প্রাণীর গাত্রেও শতসহস্র প্রাণী বিচরণ করিতেছে। একখানি প্রস্তরেতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে, সেই সমস্ত ছিদ্রদেশও অসংখ্য প্রাণীতে পরিপূর্ণ। প্রতি পরমাণুতে পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর প্রাণীসমূহ অবস্থান করিতেছে,ক্রীড়া করিতেছে, পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে, কৌশলক্রমে কেহ পলায়ন করিতেছে,কেহ বা অনুধাবন করিয়া কাহাকে বধ করিতেছে। আবার যখন স্থূল জগতে অবলোকন করি, সমুদ্র হ্রদ ও নদ নদী সকল অগণ্য প্রাণীতে পরিপূর্ণ। পর্ব্বত, অরণ্য, মরুদেশ, প্রান্তর সর্ব্বস্থানেই কতশত পশু পক্ষী, স্থলে ও আকাশে বিচরণ করিতেছে, নিজ নিজ ভক্ষ্য অন্বেষণ এবং স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

ফন্ টেনীল সাহেব তাঁহার 'জগতের বহুত্ব'* প্রতিপাদক গ্রন্থে এই জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে যখন এই পৃথিবী অগণ্য প্রাণীর আবাস ভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন আকাশে যে অগণ্য বৃহৎ২ লোকমণ্ডল সুসজ্জিত রহিয়াছে, তাহারা কি ব্রহ্মাণ্ডপতির সৃষ্টিরাজ্যে শূন্য স্থল হইয়া আছে? সেই সমস্ত জগৎওযে স্ব স্ব প্রকৃতি উপযোগী জীবসমূহের আবাস স্থান, এরূপ অনুমান করা কি যুক্তি সঙ্গত নহে?

সংখ্যাগণনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা যখন এই জীব সঙ্কুলের প্রকৃতি পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়! কি ইহাদিগের বৈচিত্র, কি ইহাদিগের চরিত্র, কি ইহাদিগের কার্য্যকলাপ, যে বিষয় আমরা চিন্তা করি, তাহাতেই বিমুগ্ধ হই। এই প্রাণী সকল কেমন স্তরে স্তরে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে! ক্ষুদ্রতম কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণী সকল কেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে! জড় প্রায় কীট সকল জড় পদার্থ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ-প্রায় প্রাণী সকল, উদ্ভিদ পদার্থহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। জলচর স্থলচরের প্রকৃতিতে উত্থিত হইতেছে, মৎস্য বিমানচারী বিহঙ্গগণের ন্যায় পক্ষ ধারণ করিয়াছে। দ্বিপদ চতুষ্পদের সমতুল্য হইতেছে, চতুষ্পদ দ্বিপদের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। এক শ্রেণীর

*Plurality of worlds.

মধ্যেও আয়তন ও প্রকৃতিগত নানা বিধ বৈলক্ষণ্য বশতঃ কত অসংখ্য প্রকার বৈচিত্র সাধিত হইয়াছে। প্রাণীজগতের এই বৈচিত্র দর্শনে কাহার মন না পুলকিত হয়!

এই বৈচিত্র যে কেবল বাহ্য আকারগত তাহা নহে। যখন আমরা এই বিচিত্র প্রাণী মণ্ডলীর জ্ঞান ভাব পর্য্যালোচনা করি, তখনও আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই প্রাণী জগতে জ্ঞানভাবের কেমন ক্রমশঃ বিস্ফুরণ হইয়াছে! ক্ষুদ্রতম প্রাণীর একমাত্র ঈষৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ জ্ঞানশীল, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রকৃতি সম্পন্ন, মানবচেতনা পর্য্যন্ত জ্ঞান ভাবের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, কি অদ্ভুত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিতেছে। আবার জাতি বিশেষে এক এক জ্ঞানের কতদূর সম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে প্রকার জীব জন্তু যে পরিমাণে জ্ঞানে সম্পন্ন হইয়াছে, সেই জ্ঞান সে প্রাণীর প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী। বস্তুতঃ প্রত্যেক প্রাণীর জ্ঞান তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ বলিয়া স্থির করিতে হয়। প্রাণী জগৎ মধ্যে কোন প্রাণী অসম্পূর্ণ নহে।

প্রাণীজগৎ পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাই, ঈষৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞান, ক্রমশঃ পশু সংস্কারে উন্নত হইয়াছে, পশুসংস্কার আবার ক্রমে ক্রমে মানবীয় বুদ্ধিতে উত্থিত হইয়াছে—পৃথিবীতে জ্ঞান ভাবের এই চরম সীমা। এই জ্ঞানভাব হইতে আমরা অনন্ত জ্ঞান পর্য্যন্ত একটী অসীম জ্ঞান রাজ্য অনুভব করিতে পারি। এই অসীম জ্ঞান রাজ্য যে পরিশূন্য থাকিবে তাহা কখন সম্ভবপর নহে। মানব বুদ্ধির জ্ঞানভাবে আমরা যে জ্ঞানের উদ্রেক ও প্রারম্ভ মাত্র দেখিতে পাই, তাহার ক্রমোন্নতি অবশ্য অন্য স্থানে সাধিত হইয়াছে। এ প্রকার জগৎ সকল থাকা সম্ভব যেখানে মানব চেতনা, জ্ঞানের ক্রমোন্নত শ্রেণীর নীচতম দেশ অধিকার করিয়াছে। সুধীবর লক, চেতন জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে এই প্রকার অনুমানে উপনীত হয়েন। এ প্রকার অনুমান কখন যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয় না।

লকের এই অনুমানানুসারে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে বোধ হয় পশুসংস্কার এবং দেবজ্ঞানের মধ্যদেশে মানব বুদ্ধি অবস্থিত রহিয়াছে। পৃথিবীর চেতনা রাজ্যে যাহাকে আমরা সর্ব্বোচ্চ জীব বলিতেছি, দেবজ্ঞানের চেতনা রাজ্যে তিনি সর্ব্ব নীচ শ্রেণীতে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডপতির জড় জগতের সৃষ্টিকাণ্ডে

যেমন অসীম ও অপরিজ্ঞেয়, তাঁহার জ্ঞান জগতের সৃষ্টি ব্যাপার তদপেক্ষা অধিকতর অপরিজ্ঞেয় ও অনন্ত। এখন তবে আমরা বলিতে পারি কি না, মনুষ্য যদি সৃষ্ট না হইত, ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য কি অলক্ষিত থাকিত, ঈশ্বরের মহিমা কি সঙ্গীত হইত না? মানব কি ঈশ্বরের কণামাত্র মহিমা বুঝিতে পারে? দেব লোক হইতে দেব লোকে তাঁহার মহিমা সঙ্গীত হইতেছে। উচ্চ হইতে উচ্চতর রবে তাহা ব্রহ্মাণ্ডময় প্রচারিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে!

সহোদর সহোদরা।

সহোদর এবং সহোদরার ন্যায় আত্মীয় কে? এক পিতা মাতার রক্ত শরীরে, আজন্ম এক গৃহে বাস, একত্রে শয়ন, একত্রে ভোজন, একত্রে ক্রীড়া, একত্রে সকলি। এই সম্বন্ধ যেমন স্বাভাবিক, বালক কালে সহোদর সহোদরাদিগের ব্যবহারও সেই রূপ স্বভাবিক থাকে। তখন তাহাদের স্নেহের পথে ভয়, লোকলজ্জা, অবিশ্বাস ও হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি কোন বাধা থাকে না। তাহারা অবাধে ভাল বাসে এবং অবাধে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমাদের দেশে বয়োবৃদ্ধি সহকারে বালক কালের সেই অসঙ্কুচিত ভাল বাসা ও স্বাভাবিক ব্যবহার অন্তর্হিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত "দাদা" ও প্রাপ্তবয়স্কা "বোন" এই উভয়ের হৃদয় অনেক অন্তর হইয়া পড়ে। শৈশব কালে হয়ত এক মাতার দুই জানুতে দুই জন বসিয়া খাদ্য দ্রব্য লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছেন, কিন্তু পরে সেই মাতাকে এক সঙ্গে মা বলিতে যেন পরস্পরের লজ্জা বোধ হয়। ভাই ভগিনীর এরূপ ভাবান্তর নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিতে হইবে। ইহার কারণ কি? বিবাহের পর সহোদরাগণ পর হইয়া যান, সেই জন্যই কি? আমাদের বোধ হয় এদেশে স্ত্রী জাতিকে নীচ এবং নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান থাকাই ইহার কারণ, বালক কালে সে জ্ঞান থাকে না সুতরাং ভাল বাসা ও স্নেহ স্বাভাবিক নিয়মেই কার্য্য করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সহোদরদিগের মনে সেই ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে। অনেক পরিবারে

বাল্য কাল হইতেই "পোড়ামুখী, লক্ষ্মীছাড়ী, হতভাগী" প্রভৃতি সহোদরাদিগের ডাক নাম রাখা হয়। পিতা মাতা কন্যাদিগের সমক্ষে পুত্রগণের প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত প্রকাশ করেন এবং সে হতভাগিনীরাও ক্রমে ক্রমে আপনাদিগকে নীচ নিকৃষ্ট এবং জঘন্য ভাবিতে শিক্ষা করে। সেই জন্যই বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে " দাদার " সহিত মিশিতে সাহস হয় না। চোরের ন্যায় দাদাকে দূরে দূরে পরিহার করিয়া বেড়ায়। তাহারা " দাদার " কষ্টে পদ্ম চক্ষের অনেক বিন্দু জল ফেলিতে প্রস্তুত, কিন্তু দাদা তাহাদের কষ্টে এক বার মুখ ফিরিয়া দেখিতে প্রস্তুত নন। বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকগণের সহিত পবিত্র ভাবে একত্র হইয়া দুই দণ্ড কথোপকথন করাও এদেশীয় পুরুষদিগের পক্ষে অসম্ভব, সহোদর সহোদরার দূরত্বের ইহাও একটী কারণ। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের রমণীগণের অবস্থা বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করিয়া থাকেন,তাঁহাদের এবিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং ক্রমে ক্রমে এ দূষণীয় ভাব দূর করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্রাণের ভগিনি! বসো সুহাসিনি! নিজে আমি বোন্ বর্ণিব তোমায়,
হৃদয়ের দ্বার, খুলে একবার, দেখাব সবারে, প্রণয় কোথায়।
নীচ কবি যারা, নাহি জানে তারা, পশু ভাব বিনা বিশুদ্ধ প্রণয়,
তাই ভাই হয়ে, প্রেম তুলি লয়ে, আঁকিব তোমারে হইয়ে নির্ভয়।
সদা হাসি হাসি, কিবা ভাল বাসি, ওই মুখ ছবি দেখিতে তোমার,
দেখিলে হৃদয়, প্রেমে পূর্ণ হয়, ইচ্ছা হয় দেখি বসে অনিবার।
প্রসন্ন বদনে, প্রসন্ন নয়নে, "দাদা" সম্ভাষণে যবে কথা কও,
অক্ষরে অক্ষরে, হৃদয়ের তারে, কি বাদ্য যে বাজে অবগত নও।
প্রীতি প্রফুল্লিত, বিনয়ে ভূষিত, হেন মুখ খানি কে দেখাতে পারে,
তুমি বোন যার, কি আনন্দ তার, তাই ভালবাসি সাধে কি তোমারে ?
রূপে গৃহস্থল, করেছ উজ্জ্বল, কিন্তু যে সুন্দর হৃদয় তোমার!
স্নেহের আলয়, কোমলতাময়, ত্রিভুবনে নাহি তুলনা তাহার!
শৈশব কাননে, খেলেছি দুজনে, বসিয়াছি স্নেহে হৃদয় খুলিয়া;
কায় গেছে গেছ, পরের হয়েছ, জনমের মত গিয়াছ ছাড়িয়া—
তাতে দুঃখ নাই, কিবা সুখ পাই, সতী পতিব্রতা শুনিয়া তোমায়!

যত মনে স্মরি, আশীর্ব্বাদ করি, ভাবি দাদা হয়ে পড়ি তব পায়।
ও চারু নয়নে, যেন এ জীবনে, বিষাদের জল কভু নাহি ঝরে,
প্রাণের যাতনা গভীর বেদনা, কখন পেওনা সরল অন্তরে।
প্রেমে সুশোভিত, চির প্রফুল্লিত, মুখপদ্ম সম থাকুক তোমার,
যখ'ন আসিবে, হাসি দেখাইবে, দেখায়ে জুড়াবে, হৃদয় আমার।
স্নেহের আধার, জনক আমার, স্নেহময়ী মাতা যে মুখে মিলিত,
দেখে সেই মুখ, পাসরিব দুখ, আনন্দে মগন হইবে এ চিত।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

ব্যঞ্জনাদি যে সকল খাদ্য রন্ধন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, সে সকল যাহাতে উত্তম রূপে পাক করা হয় এবিষয়ে গৃহিণীর সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করেন রন্ধন কার্য্যটি অতি ক্লেশকর, স্ত্রীলোকদিগকে একার্য্যে রত রাখা অনুচিত। এটি ভ্রম। আহারের তত্ত্বাবধান যে স্ত্রীলোকেরই কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই, কেননা, জগদীশ্বর তাঁহার স্তনে শিশুর আহার প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়াছেন। বিবিরাও স্বদেশে একার্য্য নিত্য করিয়া থাকেন। স্ত্রীজাতিরও স্বভাব এই যে তাঁহারা উত্তম রূপে পাক করিয়া যে আহার প্রস্তুত করেন, তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে অতিশয় আহ্লাদিত থাকেন। বেতনভোগী লোকদ্বারা উক্ত কার্য্য অনেক স্থলে সম্পাদিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা তাহা কেন ক্রমেই সুসম্পাদিত হইতে পারে না। রন্ধন ও পরিবেশন নিমিত্ত ধনীরা লোক নিযুক্ত করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু গৃহিণী স্বয়ং তত্ত্বাবধান না করিলে পরিবারের কাহারও আহারে তৃপ্তি লাভ হইতে পারে না। যিনি কোন উপাদেয় বস্তু পাইয়া আপন পুত্র কন্যা ও স্বামীকে অগ্রে না দিয়া কখন আপনার মুখে তুলিতে পারেন না, যিনি স্থল বিশেষে আপনি আহারে বঞ্চিত থাকিয়াও তাহাদিগকে আহার প্রদান করেন, যিনি তাহাদিগকে তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করাইয়া স্বয়ং অবশিষ্ট মাত্র ভোজন করিয়াই প্রীত হয়েন, এমন গৃহিণীর নিকট আহার করিয়া যেমন তৃপ্তি-

লাভ করা যায়, তেমন আর কোন রূপেই হইতে পারে না। গৃহিণী অপেক্ষা অপর লোকে রন্ধন কার্য্যে অধিক নিপুণ হইলেও তাঁহার ন্যায় কেহই যত্ন লইয়া আহারের পরিতৃপ্তি প্রদান করিতে পারেন না। অতএব পাকক্রিয়ায় নিপুণ হওয়া গৃহিণীর একটী প্রধান গুণ।

পাকক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ সামান্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন শিক্ষা করা আবশ্যক, পরে যাহারা যেরূপ সুরুচিকর খাদ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা রন্ধন করিতে শিক্ষা করা উচিত। মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করাও কর্ত্তব্য, কেননা যদিও সে সকল বস্তু প্রায় কেহই গৃহে প্রস্তুত করেন না, কিন্তু যাহারা প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহাদিগের নিপুণতা অনেকেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। অতএব তাদ্বিষয়ে পারগতা থাকা গৃহিণীর একটী প্রশংসনীয় গুণ তাহার সন্দেহ নাই। অন্নব্যঞ্জন ও মাংস রন্ধন এবং পিষ্টকাদি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করণ শিক্ষা করা যেমন আবশ্যক, তেমনি আচার মোরব্বা ও পানীয় অর্থাৎ সরবৎ আদি প্রস্তুত করাও আবশ্যক। আহার প্রস্তুত করণ বিষয়ে গৃহিণীকে এত শিক্ষা করিতে হয়, যে তাহা লিখিতে গেলে এক খানি গ্রন্থ হইয়া উঠে। কথিত আছে নলরাজা পাকক্রিয়াতে অতি সুনিপুণ ছিলেন, তিনি রন্ধন ও পাকের সম্পূর্ণ প্রণালী প্রকাশ করেন। পরে পাণ্ডবদিগের সময়ে ভীমসেন তদ্বিষয়ক আর এক খানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, পরে বিক্রমাদিত্যের সময়ে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইহার পর হিন্দুদিগের রন্ধন প্রণালী ক্রমশঃ লোপাবস্থায় পতিত হয়। অবশেষে আকবর বাদসাহ সেই সকল সংগ্রহ করাতে এখন মোগলাই রন্ধন প্রণালী এত বিখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে ইহার প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এখন উক্ত বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে হইলে প্রথমতঃ এদেশীয় রন্ধনব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের মতে অন্ন, পরমান্ন, ব্যঞ্জনাদি সামান্য চলিত রন্ধন, দ্বিতীয়তঃ মোগল মতে মাংস রন্ধন, তৃতীয়তঃ ময়রাদিগের মতে ছানার ও নারিকেলের মিষ্টান্নের পাক ও পশ্চিমের হালুইকর দিগের মতে সুজি, ডাল, কুমড়া ও ক্ষীরের মিষ্টান্নের পাক, চতুর্থতঃ পশ্চিম নিবাসী দিগের মতে আচার ও মোরব্বা প্রস্তুত করিবার প্রণালী, ইংরাজদিগের মতে কেক, পুডিং বিস্কুট ও পার্ম রুটি প্রস্তুত করিবার প্রণালী এবং দেশীয় সাধারণ

মতে রুটি, লুচি,পুরী ইত্যাদি সমুদয় তৈয়ারি করিবার নিয়ম শিক্ষা করিতে হয়। এবম্বিধ নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী যাহাতে শিক্ষা করা যায়, অদ্যাপি এরূপ পুস্তকের অভাব থাকা একটি দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। যাহাহউক পুস্তক পাঠ মাত্রে এ সকল বিষয় সম্পূর্ণ শিক্ষা করা যায় না, অতএব গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে কোন একটি নূতন বিষয় শিক্ষার সুযোগ পাইলে, তাহা শিক্ষা করিতে ত্রুটি করিবেন না, এইরূপে রন্ধন বিষয়ে ক্রমশঃ পটু হইতে পারিবেন। নারায়ণের গৃহিণী লক্ষ্মী, শিবের গৃহিণী অন্নপূর্ণা, পাণ্ডবদিগের গৃহিণী দ্রৌপদী ইহাদিগের একটি প্রধান গুণ এই ছিল, যে তাঁহারা পাকক্রিয়ায় সুনিপুণা ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা উৎকৃষ্ট গৃহিণীর আদর্শ স্থল হইয়াছেন।

রন্ধনাদি কার্য্যে নিপুণ হওয়া গৃহিণীর পক্ষে যেমন আবশ্যক, কি কি বস্তু গুরুপাক, কি কি বস্তু লঘু পাক, কাহাদের শীতল গুণ, কাহাদের উষ্ণ গুণ, কোন্ বস্তু কেমন পুষ্টিকর ইত্যাদি জানিয়া আহারের যথোচিত নিয়ম করিয়া পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষা তাহার পক্ষে তেমনি কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষায় দ্রব্যগুণ বিষয়ক সম্পূর্ণ গ্রন্থ নাই। সেরূপ গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে হইলে প্রথমতঃ তণ্ডুল ডাল ফল মূল তরকারি ঘৃত দুগ্ধ শর্করা ইত্যাদি অমিশ্র খাদ্যের গুণ, পরে মিশ্রিত পদার্থের গুণ, কি কি দ্রব্য কি কি রোগের সুপথ্য, কি কি দ্রব্য কি কি রোগের কুপথ্য, কোন্ সময়ে কি ঋতুতে কি দ্রব্য পাওয়া যায় ও সংগ্রহ করিতে হয় এ সমুদয় বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। এক্ষণে গর্ব্ভিণী নারী ও শিশু সন্তানদিগের আহারের নিয়ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

অনেকে মনে করেন যে গর্ভাবস্থায় আহার বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, এটি ভ্রম। তাহার প্রমাণ এই যে গর্ভাবস্থায় প্রথমেই বমনোদ্বেগ হয়। লঘু ও সুপাচ্য দ্রব্য যথা রুটি আহার করা কর্ত্তব্য, কেননা আহার লঘু না হইলে গর্ব্ভাবস্থায় অতি শীঘ্র উদরাময় ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ অধিক আহার করিলে স্বভাবতই কষ্ট, গর্ব্ভাবস্থায় সেই কষ্ট আরো অধিক হয়। সুপাচ্য ও পুষ্টিকর দ্রব্য আহার না করিলে শরীর বলিষ্ঠ থাকে না এবং গর্ব্ভিণীর শরীর নীরোগ ও বলিষ্ঠ থাকা আত্মহিতের জন্য যেমন,

গর্ব্ভস্থ শিশুর হিতার্থেও তদনুরূপ আবশ্যক। কিন্তু অনেকে মনে করেন, যে গর্ব্ভাবস্থায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আহার না পাইলে, গর্ব্ভস্থ শিশুর পুষ্টি সাধন হয় না। তাহা সত্য নহে, গর্ব্ভস্থ শিশুর ভাগ বিবেচনা করিয়া অধিক আহার প্রদান করা মূর্খের কার্য্য, ক্ষুধা ও রুচিদ্বারা আহারের নিয়ম করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু গর্ব্ভাবস্থায় যদি কুপথ্য দ্রব্যে রুচি হয় তাহা ত্যাগ করাই শ্রেয়।

সন্তান প্রসূত হইলেও সেইরূপ সাবধান থাকা উচিত, কেননা তদবস্থায় আহার দোষে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা আরোগ্য করা সহজসাধ্য নহে যথাঃ—

"মিথ্যাহারাৎ সূতিকায়াযো ব্যাধি উপাযায়তে।
স কৃচ্ছ্র সাধ্যো হ সাধ্যো বা ভবেত্তৎ পথ্যমাচরেৎ।

প্রসূতির বিহিতাচার করা তাঁহার নিজের হিতের জন্যও যেমন, শিশুর হিতের জন্যও তেমনি আবশ্যক, কেননা মাতৃ স্তনদুগ্ধই শিশুর একমাত্র আহার এবং সেই স্তনদুগ্ধ প্রসূতি দোষে দূষিত বা নষ্ট হয়। যথা

"অবাৎসল্যাদ্ভয়াৎ শোকাৎ ক্রোধাদপ্যণ তর্পণাৎ।
স্ত্রীণাং স্তন্যং ভবেৎ স্বল্পং গর্ভান্তর বিধারণাৎ।

সন্তানের প্রতি স্নেহ না থাকা প্রযুক্ত ও ভয়, শোক, ক্রোধ এবং লঙ্ঘন ও পুনরায় গর্ব্ভধারণ প্রযুক্ত স্তন দুগ্ধের হানি হয়।

"মিথ্যাহার বিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
দূষয়ন্তি পয়স্তেন শরীরে ব্যাধয়ঃ শিশোঃ॥

অনিয়মিত আহারকারিণী স্ত্রীলোকের বাতাদি দুষ্ট হইয়া স্তন দুগ্ধাদি দূষিত করে এবং তাহাতে শিশুর শরীরে পীড়া জন্মে।

প্রসূতিদিগের বিলক্ষণ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আপন শিশুদিগকে স্তনপান করান ঈশ্বরের নির্ব্বন্ধ। কোন২ ধনীলোকের পরিবারেরা এ নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া থাকেন, সে বড় লজ্জার কথা। ধনমদে বা সভ্যতামদে মত্ত হইয়া এরূপ করাও যেমন, সাধারণে জল পান করে বলিয়া জলের পরিবর্ত্তে সুরাপান করাও তেমনি। স্তন পান করাইবার সময়ে মাতা স্নেহময়ী মূর্ত্তিতে অতি যত্ন সহকারে স্তন পান করাইবেন।

"তত্র মাতা প্রশস্তাঙ্গী চারুবস্ত্রা পুরোমুখী।
উপবিশ্যাসনে সম্যক্ দক্ষিণং স্তনমম্বুনা।
প্রক্ষাল্যোষৎ পরিস্রাব্য মন্ত্রাভ্যামভিমন্ত্রিতং।
উদঙ্মুখং শিশুং ক্রোড়ে শনৈরাধায় পায়য়েৎ।
অস্রাবিতং স্তনংবালঃ পিবেৎ স্তন্যেন ভূয়সা।
পূর্ণস্রোতা বমিশ্বাস কাসৈ র্ভবতি পীড়িতঃ।

মাতা প্রশস্তাঙ্গী হইয়া উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বমুখে বসিয়া, দক্ষিণ স্তন জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া এবং কিঞ্চিৎ দুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া * * * উত্তর মুখ শিশুকে আস্তে২ ক্রোড়ে করিয়া পান করাইবে, তাহা না করিলে পূর্ণস্রোত স্তন্য পান দ্বারা বমন শ্বাস কাসাদি রোগ হয়। ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট। উভয় স্তনই সমান পান করান কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া এক স্তন অধিক পান করাইলে অপর স্তনে দুগ্ধ জমিয়া পীড়া উপস্থিত হওয়া সম্ভব।

মাতার স্তন দুগ্ধই শিশুর প্রথম আহার, প্রসবান্তে স্তন দুগ্ধের যে রূপ বিরেচন শক্তি থাকে, তদ্দ্বারা শিশুর বিশেষ উপকার হয় এবং সে উপকার-টি উপায়ান্তরে সুলভ হয় না। অতএব প্রসবান্তে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মাতৃ স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হইলে শিশুকে স্তন পান করাইবে। ভুমিষ্ঠ হইবার পরেই শীঘ্র আহার দেওয়া আবশ্যক নহে। কিন্তু যে রূপ আহার দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা যুক্তিসিদ্ধ মতে মাতৃ শিক্ষায় লিখিত আছে যথা "এক ভাগ উত্তম নূতন গোদুগ্ধের সহিত দুই ভাগ উষ্ণ জল মিশাইয়া এবং উহাতে কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত বা দানাযুক্ত শর্করা সংযোগ করিয়া যে পর্য্যন্ত স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার না হয়, চারি ঘণ্টা অন্তর উহার কিয়দংশ সন্তানকে পান করাইবে। সন্তানের উদর পরিষ্কার না হইলে, এই দুগ্ধের সহিত কটা বর্ণ চিনি বা খাঁড় গুড় সংযোগ করা যাইতে পারে।" মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইলে তিন চারি মাস ইহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত, অন্য কোন প্রকার আহার বিশেষতঃ মাংসের যুষ দেওয়া অবিধেয়। কিন্তু মাতৃস্তনে দুগ্ধের অ-ল্পতা হইলে প্রথমতঃ সেই দুগ্ধ যাহাতে বৃদ্ধি হয়, এমন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

অসভ্যজাতির বিবরণ।

খন্দ জাতি।

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ইহারা জানি বা দৈবজ্ঞকে ডাকে, তিনি পাঁজি পুথি খুলিয়া তিথি নক্ষত্র দেখিয়া উহার ভাগ্য নির্ণয় করেন। উহার প্রতিপালন জন্য ভবিষ্যতে দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিতে হইবে স্থিরীকৃত হইলে, উহাকে নব পাত্র মধ্যে রাখিয়া জীবিতাবস্থায় পুতিয়া ফেলে এবং গোরের উপর একটী মুরগী বলি দেয়।

সপ্তম দিবসে শিশুর নামকরণ হয়। খন্দদিগের বিশ্বাস যে পূর্ব্ব পুরুষেরা আসিয়া স্ব গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। কে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিবার নিমিত্ত জলপূর্ণ পাত্রে স্বর্গীয় কর্ত্তাদিগের এক২ জনের নাম করিয়া এক একটী চাউল নিক্ষেপ করা হয়, যে নামে উহা ডুবে, সেইটী সন্তানের উপাধি হয়। ঐ উপলক্ষে গ্রামস্থদিগকে একটী ভোজ দেয়।

পুত্র বা কন্যা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃভবনে কালযাপন করেন। তদূর্দ্ধে সকলকেই কুমার বা কুমারী ভবনে রাত্রি যাপন করিতে হয়। বোয়াড প্রভৃতি প্রদেশে যুবক উপার্জ্জনক্ষম না হইলে দার পরিগ্রহ করে না। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে ইহাদিগের একটী সমারোহপূর্ব্বক মেলা হয় এবং নৃত্য গীত আমোদ বিলক্ষণ হইয়া থাকে, এই সময়েই যুবক যুবতীর পরস্পর প্রণয় হইলে এবং কন্যা কর্ত্তাকে পণ দিতে পারিলেই বিবাহ হয়। তাদৃশ সঙ্গতি না থাকিলে কখন২ মনোনীতাকে সর্ব্বপ্রথম হরণ, পরে শ্বশুরের সহিত অর্থ চুক্তি করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনেকস্থলে অপরিণত বয়সে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সন্তানের বিবাহ দেন। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের একটী অদ্ভুত প্রথা দেখা যায়। বর কন্যাপেক্ষা ৩।৪ বৎসরের ছোট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ইহা হইতেই বোধ হয় আমাদিগের স্ত্রীআচারে "বর বড় বা কনে বড়" বলা প্রচলিত হইয়াছে। আর্য্য জাতি স্বমত বিরুদ্ধ ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া, পরাজিত অনার্য্য দিগের তৃপ্তি সাধনার্থ এই কথা গুলি কি চলিত করিয়াছেন? বিবাহ সম্বন্ধ হইলে সর্ব্ব প্রথম বর ও কন্যাকর্ত্তায় পণ চুক্তি হয়।

বর পক্ষ ২০।৩০টী গবাদি কন্যাকর্ত্তাকে দান করেন। তৎপরে বর সহ যাত্রীরা চাউল ও মদ লইয়া কন্যার বাটীতে যায়। তথায় পুরোহিত পান পাত্র পূর্ণ করত ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া দেন। পরে বৈবাহিকেরা পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া বিবাহ সিদ্ধ হইল কহেন। ইহার পর পান ভোজন নৃত্য গীত হইয়া থাকে। রাত্রি অধিক হইলে নব দম্পতি দ্বয়ের মাতুলেরা আপন আপন ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীকে কোলে করিয়া লয়, কিছুক্ষণ পরে পরস্পরে বোঝা বদল করিলে বরের মাতুল কন্যাকে লইয়া পলায়ন করে। তদুপলক্ষে উভয় পক্ষীয়েরা দলবদ্ধ হইয়া এক দল কন্যাকে কাড়িয়া লইতে অপরে রক্ষা করিতে চেষ্টা পায়। কৃত্রিম যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অবশেষে বরপক্ষ জয়ী হইয়া বধূকে শ্বশুর গৃহে লইয়া যায় এবং যে পর্য্যন্ত স্বামী বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, কন্যা গুরুজনের শুশ্রূষা ও গৃহ কার্য্যের সাহায্য করেন। পরে স্বতন্ত্র গৃহস্থ হন। আমাদিগের মধ্যে কন্যার মামাশ্বশুর ভয় কি এই অসভ্য প্রথার ভগ্নাংশ রূপে অবস্থিতি করিতেছে?

ইহাদিগের যোষাগণের স্বাধীনতা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। মনে করিলেই স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, কেবল গর্ভাবস্থায় থাকিলে ও সন্তান প্রসব করিলে এক বৎসর কাল পারে না। প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত না হইতে হইতেই ২।৪ বার পতি পরিবর্ত্তন করে নাই এমন কামিনী অতি বিরল। আবার ইহারা যে কোন পত্নীহীন ব্যক্তির বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন, তাঁহাকেই ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইতে হয়। তাহা না করিলে তাহাকে সাধারণে কাপুরুষ বলিয়া গণনা করে। এপ্রকার পতিত্ব বরণে বিশেষ আড়ম্বর বা উৎসবের প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্ব স্বামী ইহাতে কাহাকে কিছু বলিতে পারেন না, কেবল শ্বশুরের নিকট হইতে পণের টাকা চাহিতে সক্ষম। এই অর্থ কখন ফিরাইয়া দিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, কিন্তু তন্নিমিত্ত শ্বশুর কুলের সকলেই আবদ্ধ। পশ্চিম অঞ্চলের রাজকুমার নামক ক্ষত্রিয় জাতি কন্যার বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় হয় বলিয়া সদ্যঃপ্রসূতা দুহিতাকে ইতিপূর্ব্বে নষ্ট করিত। খন্দদিগের পণ পুনঃ প্রদানের বাধ্যতাই পুত্রী হননের প্রকৃত কারণ। যেখানে সেখানে পণ ৩।৪

টাকা মাত্র, তথায় এ কুপ্রথা প্রচলিত নাই। আর্য্য জাতি পূর্ব্বোক্ত প্রথার দুর্গতি দেখিয়াই কি কন্যা দানের এত গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন? কিন্তু সেই দানের এক্ষণে কি দুর্দ্দশা? এক্ষণে বিশেষতঃ কায়স্তদিগের পক্ষে কন্যাভারগ্রস্ত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে, কাহারও কাহারও ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। যাহাহউক আদিদেব উপাসকদিগের মধ্যেই কন্যা হনন প্রথা প্রচলিত। বর্ষে২ অন্যূন এক সহস্র বালা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র নষ্ট হয়।

এরূপ স্বাধীনতা সত্ত্বেও খন্দ বামাগণ ব্যভিচার দোষে দূষিত। বস্তুতঃ ইহাদিগের মধ্যে সতীত্ব ধর্ম্মের বিশেষ আদর দেখা যায় না। দেবী উপাসকদিগের মধ্যে অবলাগণের অধিক বল। কন্যা হত্যা প্রচলিত থাকাতে ইহাদিগের সকল পুরুষের বিবাহ হওয়া ভার, একাধিক পত্নী কাহারও দেখা যায় না। বড় দেব উপাসকদিগের মধ্যে কাহারও২ বহু ভার্য্যা আছে।

খন্দেরা উৎকলের পূর্ব্বনিবাসী, হিন্দুদিগের দ্বারা ক্রমশঃ তাড়িত হইয়া পর্ব্বত ও উপত্যকা প্রদেশ আশ্রয় করিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে কতক লোক হিন্দু রাজাদিগকে কর দিত এবং মজুরী করিয়া দিনপাত করিত। উপত্যকা প্রদেশ বাসীরা হয় জমির খাজনা দেয় নয় আবশ্যক মতে জমিদারের হইয়া লড়ে। পার্ব্বতীয়েরা নিতান্ত স্বাধীন, তবে ইচ্ছা মতে যুদ্ধ সময়ে প্রতিবাসী ভূস্বামীকে আনুকূল্য করিয়া থাকে। কৃষি, মৃগয়া ও যুদ্ধ এই তিন বিষয়ে ইহারা পটু। হিন্দু কামার কুমার, গোয়ালা শুঁড়ি ও বর্ণ সঙ্কর প্যান বা তন্তুবায় ইহাদিগের গ্রামে সকল আবশ্যক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে। বাল্যকাল হইতে ইহারা রণবিদ্যায় দীক্ষিত হয়। গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত বর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া এবং পদ দ্বয়ে কাপড় বাঁধিয়া, হস্তে বাইস ধরিয়া শত্রু অভিমুখে গমন করে। উৎসাহ বর্দ্ধন ও সৎপরামর্শ দান নিমিত্ত প্রাচীনেরা এবং জল ও খাদ্যাদি যোগাইবার নিমিত্ত বামাগণ ইহাদিগের সঙ্গে যায়। যাজকেরা অনুমতি দিলে সর্ব্বপ্রথম ঢিল ও পাথর ছোড়া ছুড়ি করে এবং বামাগণ ইহা আনিয়া দেয়; কিঞ্চিৎ নিকটস্থ হইলে তীর ছুড়িতে থাকে এবং সর্ব্বশেষে কাটাকাটি। একজন শত্রুর পতন হইলেই সকলে গিয়া তাহার রক্তে আপন আপন অস্ত্র ডুবাইয়া লয় এবং হত ব্যক্তির

ডান হাতটী কাটিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট ফেলিয়া দেয়। অবশেষে বীরত্বের চিহ্ন স্বরূপ উহা গ্রামস্থিত কোন গাছে লটকাইয়া রাখে। প্রাচীন কালীন যুদ্ধের সহিত ইহাদিগের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। খন্দদিগের যথেষ্ট পরিমাণে গরু মহিষ, শূকর ও ছাগ থাকে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধান্য, দেধান, ডাউল, তামাক, হলুদ, শরীষা, আরোরুট আবাদ করে এবং উহাদিগের বিনিময়ে লবণ, সূতা, কাপড়, লৌহ, পিত্তলের বাসন, ও অলঙ্কার ক্রয় করে। পার্ব্বতীয়েরা সকলেই ভূস্বামী। কেহ কাহারও অধীন হইয়া থাকে না। আবাদ কালে প্রাতে উঠিয়া ভাত ও মাংস আহার করিয়া, গরু, লাঙ্গল ও বাইস কাঁধে করিয়া বাটী হইতে বাহির হয়, ৩টা বেলা অবধি কর্ম্ম করিয়া স্নানানন্তর গৃহে ফিরিয়া আইসে। অধিক কাজের ভিড় পড়িলে ক্ষেত্রে আহার লইয়া যায়, বীজ বপন ও শস্য কর্ত্তন কালে বামাগণ ইহাদিগের বিলক্ষণ সাহায্য করে, এতদ্ভিন্ন তাহারা গবাদি চরায়।

খন্দ দিগের মধ্যে পিতাই পার্থিব ঈশ্বর। তাঁহাকে অমান্য করা মহাপাপ। তাঁহার জীবদ্দশায় সন্তানগণ সকলেই একান্নভুক্ত থাকে, কাহারও স্বতন্ত্র বিষয় হয়না। বাটীতে তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং তাঁহার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। পৃথক্ পৃথক্ গ্রামে অনেক ভিন্ন ভিন্ন গোত্র বাস করে, কিন্তু পল্লিস্থাপকের বংশ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আবে বা মণ্ডল বলিয়া সকলের নিকট মান্য। অন্যের ন্যায় আবেও স্বয়ং চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। পদ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অন্য কোন প্রাপ্তি নাই, কেবল উৎসবকালে সভায় তিনি সর্ব্ব উচ্চ স্থান পান। বহু গ্রামের অধ্যক্ষকে পিব বা মাল্কি কহে। এতদ্ভিন্ন এক২ জন গোত্রপতি এবং সকল জাতি বা গোত্রের একজন কর্ত্তা থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে ইনিই জাতীয় সভা আহ্বানে সক্ষম। মাঠে মজলিস হয়। এই স্থলে সকলেরই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসিত হইয়া থাকে। বাদী প্রতিবাদী উভয়কে চাউল পড়া খাওয়াইয়া জবানবন্দি লওয়া হয়। ইহাদিগের বিশ্বাস যে যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। ভূমি সম্বন্ধীয় বিবাদে আসামি ও ফরিয়াদি তথাকার এক২ টুকু মাটি চাখে। বঙ্গদেশে নূতন ভূমি অধিকার কালে একটুকু মাটি মুখে দেওয়ার পদ্ধতি কোথায়২ দেখা যায়! সাক্ষীগণ ব্যাঘ্র চর্ম্ম বা গিরগিটের ছাল, ময়ূর পুচ্ছ

বা উইয়ের ঢিপিতে হাত দিয়া শপথ করে, বিচারের পর অপরাধী দণ্ড স্বরূপ সকলকে ভোজ দেয়, আঘাত পাইয়া বা অনিচ্ছাধীন হত্যা করিলে প্রধানেরা অর্থাদি দিয়া চুকি করিয়া দেন, বধ করিলে হত্যাকারীর সমস্ত সম্পত্তি হত ব্যক্তির পরিবারে পায়। অঙ্গ বিকল করিলে, আহত ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অর্থদান এবং যত দিন না সারে তত দিন তাহাকে আহার যোগাইতে হয়।

ইহাদিগের পুত্রগণ স্থাবর বিষয়ের অধিকারী। কন্যাগণ অপর সকল ধনের সমান অংশী ও বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত ভ্রাতার প্রতিপাল্য। নিঃসন্তান হইলে ভূমি গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি রূপে গৃহীত হয়। পার্ব্বতীয়দের জমীর কর নাই, এবং উহা বিক্রয় করিতে হইলে ৪ জনকে তথায় উপস্থিত করিয়া, সকলের সম্মুখে দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া এক মুষ্টি মৃত্তিকা ক্রেতাকে দিতে হয়।

ইতি পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে যে খন্দ গ্রামে অনেক হিন্দু বাস করে এবং হিন্দু রাজাদিগের যুদ্ধে ইহারা অনেক সময় সাহায্য প্রদান করে। কিন্তু আবেরা হিন্দু শাস্ত্র ও ব্যবহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকাতে রাজারা একজন সদ্বংশ জাত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিসাই বা বিশ্বাস উপাধি দিয়া ইহাদিগের মধ্যে প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তিরা বংশ ক্রমান্বয়ে ঐ উপাধি ও ক্ষমতা পাইয়া আসিতেছেন। ইহারা সকলেই খন্দ বৃত্তিভোগী। ইহারা আবেদিগকে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা দেন, রাজসরকারে প্রভুর প্রতিনিধি হইয়া সন্ধি বা চুক্তি পত্রে নাম স্বাক্ষর করেন, এবং হিন্দু ও কোন২ খন্দ দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। অধিক বিদ্যা বুদ্ধি থাকাতে খন্দদিগের উপর ইহাদিগের বিশেষ আধিপত্য দেখা যায়।

ইহাদিগের মধ্যে যাজক বলিয়া জাতি বিশেষ নাই। স্বপ্নাদিষ্ট হইলে যে কেহ এই পদ অবলম্বনে সক্ষম। ইহাদিগের বিশেষ বৃত্তি নাই, অন্যের ন্যায় ইহাদিগকে চাষ করিতে হয়, তবে যজমানেরা অনুগ্রহ করিয়া যাহা কিছু দেন এবং উৎসবে ইহারা উচ্চ স্থান পান। সামান্য শ্রেণীস্থ দেবদিগকে ওঝারাও (হিন্দু) পূজা করিতে পারেন। যাজকেরা বিধর্ম্মীদিগের সঙ্গে ভোজন করা দূরে থাকুক, তাহাদের পাক করা অন্ন গ্রহণ করেন না, কিন্তু সুরাদি পানে দোষাভাব। তাহারা মনে করিলে আবার যাজক পদ

ত্যাগ করেন। কোথায়২ আবে বা গ্রামের মণ্ডলই সকল দৈব কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং দেবতা বিশেষের পুরুষ পরম্পরাগত নির্দ্দিষ্ট পুরোহিত আছে। কতকগুলি হিন্দু দেব এখানে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহাদিগের সেবা ও অর্চ্চনা ব্রাহ্মণে করিয়া থাকেন, খন্দ দেবগণের মূর্ত্তি নাই, তাহাদিগের মন্দির ও নাই। মাঠে বা নিবিড় বনে তাহাদিগের পূজা হয়।

মৃত্যু। মরিলে সকলকে দাহ করে, এবং একাদশ দিবসে আত্মীয়গণ মিলিয়া পান ভোজন করে। আবের মৃত্যু হইলে ঢাক ঢোল কাঁশর বাজাইয়া সকলকে আহ্বান করা হয়। শবকে চিতায় চড়াইয়া, উহার নিকটে একটী গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে ধান্য ও তৈজস পুতিয়া তদুপরি নিসান তোলা হয়। উহার চতুর্দ্দিকে সকলে নৃত্য করিতে থাকে। ১০ দিবস ঐ রূপ উৎসব হইয়া থাকে। খন্দেরা বিবিধ প্রকার নৃত্যে পটু। ইহাদিগের সঙ্গীতও আছে। তবে লিখিত ভাষা নাই। প্রধান ব্যক্তিরা কোন২ স্থলে হিন্দু শাস্ত্র শিখেন।

খন্দেরা সুগঠিত ইহাদিগের কপাল প্রশস্ত, হনু উচ্চ, ও নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ চেপটা, এবং চেহারা দেখিলে বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতীত হয়। ইহারা বলিষ্ঠ, সাহসী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয়—অধীনতা অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয় জ্ঞান করে। আবের প্রতি ইহাদের গাঢ় অনুরাগ। ইহারা বন্ধুত্বে অনুরক্ত এবং কথা দিলে কোন ক্রমেই তাহা ভাঙ্গে না, সহিষ্ণুতায় অতুল্য এবং অতিথি সৎকারে অদ্বিতীয়—আগন্তুককে কখন বাটী হইতে ফিরায় না। সে যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পারে এবং পরিজনের ন্যায় সেবা ও আদর পায়। অভ্যাগত পরম শত্রু হইলেও অবধ্য। দোষের মধ্যে ইহারা স্বজাতি ভিন্ন অপর সকলকে শত্রু বোধ করে এবং সেই জন্য তাহাদিগকে ঠকান বা লুণ্ঠনাদি করা বীরের কার্য্য বলিয়া গণনা করে। এতদ্ ভিন্ন বৈর নির্য্যাতনে ইহারা দৃঢ়সঙ্কল্প এবং সুরাপানে অতিশয় অনুরক্ত।

একণে খন্দেরা ইংরাজদিগের অধীন। মেকফার্সন, কাম্পবেল প্রভৃতি মহোদয়গণের চেষ্টা যত্ন ও কৌশলে ইহারা নরবলী ও কন্যা হত্যা প্রভৃতি কুপ্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহাদিগের সাংসারিক অবস্থারও অনেক

উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা কোমর বেড়া চির মাত্র ধারণ করিত, এখন তাহারা ১০ হাতি পাড়ওয়ালা বস্ত্র ও পিতল রূপার গহনা পরিধান করে। দেশ মধ্যে রাস্তা প্রস্তুত এবং হাট মেলা সংস্থাপিত হওয়াতে পরস্পরের গতি বিধির সুবিধা হইয়াছে এবং বিদেশীয়দিগের সমাগমে দিন দিন সভ্যতা বাড়িতেছে। ইহারা আপনাদের নিকৃষ্টাবস্থা বুঝিতে পারিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উচ্চাশা অঙ্কুরিত এবং ধনের লালসা বর্দ্ধিত হইয়াছে। লেখা পড়া শিখিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত জন্মিয়াছে, এমন কি অনেকে আপন ব্যয়ে পাঠশালা স্থাপনেও উদ্যত। বিশেষ ব্যাঘাত না হইলে অনতি কাল মধ্যে ইহারা অসভ্যতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সভ্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবে।

কুলীন বিধবা।

আলু থালু কেশ পাগলিনী প্রায়,
অঙ্গের বসন ধূলায় লুটায়,
আহা মরি মরি, কিরূপ মাধুরী,
শুকায়ে মলিন হয়েছে;
যেন মেঘ আসি, পূর্ণিমার শশী,
(কাঁদায়ে সংসার) ঢেকেছে!

২

নাহি অন্য রব সুধু হাহা কার,
ধ্বনিছে দিগন্ত ক্রন্দনে বালার;
কভু ধরাতলে, পড়ে'নাথ'বলে,
শিরে করাঘাত করিয়ে,
কভু অনর্গল নয়নের জলে
বায়রে বসন ভাসিয়ে।

৩

সিঁথি, কণ্ঠহার, বলয়, কঙ্কণ,
এ সবে কি সাধ আছেরে এখন?
যবে ধীরে ধীরে, বসুধা সভীরে
ত্যজিয়া বসন্ত যায় রে,
কুসুম-ভূষণে আর কি সুন্দরী
সাজায় সুন্দর কায় রে?

৪

এখন ও সুন্দর সীমন্তে শোভিছে
সিন্দুরের ফোঁটা, শ্রবণে দুলিছে
হিরন্ময় দুল, এখন ও তাম্বূল
রাগেতে অধর লোহিত,
এখনো বদন বিচিত্র বসনে
(যদিও হেলায়) আবৃত।

৫

এখনি ধরিবে বিধবার বেশ,
কক্ষ হবে, হায়, সুচিকণ কেশ,
বালা, কণ্ঠহার, কাড়িয়া বালার
লইবে বলাৎ হইতে;
আজ হতে তার সুখের রজনী
পোহাইল এই মহীতে!

৬

রবি অস্ত গেলে শুকায় নলিনী,

মহা কষ্টে সতী যাপয়ে যামিনী,
কিন্তু পর দিন, নিরখি নবীন
নাথের মূরতি আকাশে,
প্রেমে গদ গদ হইয়া প্রমদা
সরসী জীবনে বিকাশে।

৭

কিন্তু আজ এই স্বর্ণ কমলিনী,
এ জন্মের তরে হ'ল বিরহিণী;
সহাস্য বদন, বালার কখন,
এ জীবনে আর হবে না,
নলিনীর মত আর এ রমণী
ফিরে প্রাণ ধনে পাবে না।

৮

ধরা ধরি করি আবরি বসনে,
শব আনি সবে রাখিল প্রাঙ্গণে;
আনি তুলসীরে, দিল তুলি শিরে,
চন্দনের ফোঁটা কাটিল,
পতিত পাবনী জাহ্নবীর জল
অন্তিমে বদনে ঢালিল।

৯

পাগলিনী প্রায়, হা হা কার করি
আসিয়া প্রাঙ্গণে পড়িলা সুন্দরী;
কোথা রে এখন, সে হাস্য বদন,
নয়ন রঞ্জন প্রতিমা?
অন্তরের শোকে কাঞ্চন বরণে
পড়েছে দুঃখের কালিমা!

১০

এক মাত্র ভানু উজলে ভুবন,
বসুধারে করে প্রফুল্ল বদন;
যদি সেই রবি অপরূপ ছবি
আবরে জলদ আসিয়া,
কেন না মেদিনী আঁধার সংসার
হেরিবে তাহার লাগিয়া?

১১

হিম পতিপদ ধরিয়া সুন্দরী,
রাখিলা যতনে নিজ বক্ষোপরি;
কখন নয়ন, করি উন্মীলন,
হেরিলা নাথের বদনে,
অবিরল ধারে বহিল অমনি
বারি ধারা দুটী নয়নে!

১২

কেনা জানে, যবে আত্মীয় স্বগণ,
কাল হস্তে দেহ করে সমর্পণ,
শোকের অনল, জ্বলিয়া প্রবল,
এ হৃদয় ফেলে দহিয়া;
কত কথা তার, কত গুণগ্রাম,
উঠেরে অন্তর ছাইয়া।

১৩

"এই কি সুখের স্বপন আমার?"
কহিলা সুন্দরী কাঁদিয়া আবার,
এই কি বিধাতা, সর্ব্ব সিদ্ধি দাতা,
দাসীর কপালে লিখিল?
হস্তে দিয়া নিধি, বিধি নিদারুণ
তখনি কাড়িয়া লইল?

১৪

"এ জন্মে শুনিতে পাব তা কি আর
অমৃত মাখান বচন তাহার?
আর কি নয়নে, সে চন্দ্র বদনে,
নিরখিব আমি জীবনে?
এ দুরন্ত শেল ধরিয়া হৃদয়ে
হায়রে বাঁচিব কেমনে?

১৫

সহসা সম্মুখে রোদনের ধ্বনি
দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল তখনি,
পবনের গতি, দুইটী যুবতী,
(উন্মাদিনী যেন) ধাইছে,

সকঙ্কণ কর সজোরে ললাটে
হাহাকার করি হানিছে!

১৬

শোকের প্রবাহ বেগবান হয়ে,
বহেরে যখন শোকার্ত্ত হৃদয়ে,
হেন সাধ্য কার, সে গতি তাহার,
যতনে সহসা রোধিবে?
সিন্ধু উথলিলে তরঙ্গ সকলে
কে শৃঙ্খলে বাঁধি রাখিবে?

১৭

হাহাকারে দিক্ পূরিয়া উঠিল,
অশ্রুনীরে ধরা ভাসিতে লাগিল;
কেহ পতি কর, মস্তক উপর,
রাখিয়া, কাঁদিছে কাতরে;
কেহ পদ যুগ হৃদয়ে ধরিয়া
পড়েছে শবের উপরে!

১৮

একটী বিধবা কাঁদায় ভুবন,
তার দুঃখ ভার কে করে বহন?
তিনটী সধবা; একত্রে বিধবা,
হইল একের মরণে,
এক রবি বিনে, তিনটী নলিনী
শুকাল সরসী জীবনে!

১৯

ওরে সর্ব্বনেশে দুষ্ট দেশাচার।
এই কিরে তোর উচিত ব্যাভার?
বঙ্গ-কুল নারী, সাধ্বী সুকুমারী,
বধিস্ পরাণে নিয়ত;
বঙ্গ বাসীদের গৃহের প্রদীপ,
নিবাস্ দুর্ম্মতি সতত!

২০

অধঃ পাতে যারে বল্লালি শাসন
এ বঙ্গের তুই করিলি হরণ
গৃহ লক্ষ্মী কত, হায়, শত শত
কাঁদালি কুলের কামিনী;
বৃদ্ধ হাতে সঁপি সোণার প্রতিমা
অকূলে ডুবালি তরণী!

ঈশ্বর প্রীতিই সুখের আকর।*

ঈশ্বরের প্রতি যদি প্রীতি না হয়, আর অন্য অন্য সহস্র প্রকার সম্পদ ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও সুখ হয় না। ভগ্নি! তুমি যদি তোমার পিতাকে ভাল বাসিতে না পারিলে তোমার মত দুঃখিনী আর কেহই নাই। যিনি পিতাকে ভালবাসেন তিনি সদানন্দ। সুখময় ঈশ্বরকে যিনি ভাল বাসেন, তাঁহারই সুখ, যিনি দুঃখময় সংসারকে ভাল বাসেন, তাঁহারই দুঃখ। যথার্থ ভাল বাসাই একমাত্র সুখের কারণ। ভাল বাসা যাহার নাই, তাহার মত দুঃখী আর কে আছে? ভগ্নি! যদি পিতাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পার, তবে তোমার মত সুখী আর জগতে কেহ নাই।

*ব্রাহ্মিকা সমাজ শুক্রবার—১২ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

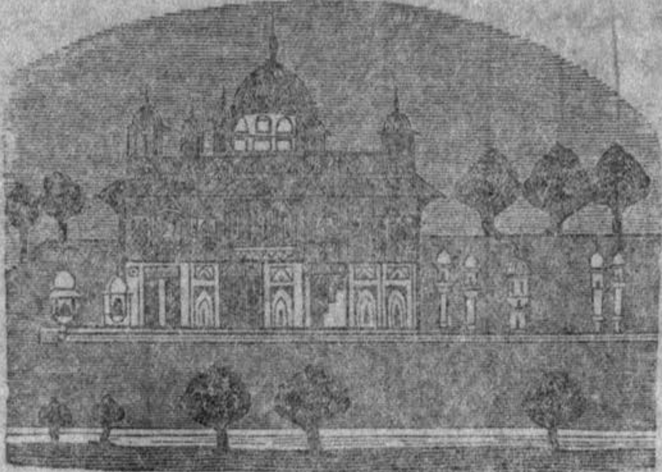
কিন্তু ঈশ্বর, সাধারণ রূপে জগৎকে কত প্রকার সুখ দিতেছেন, এ সকল ভাবিয়া এবং আলোচনা করিয়া যদি তাঁহার দয়া প্রমাণ করিতে হয় তাহা হইলে তোমরা পিতাকে যথার্থরূপে ভাল বাসিতে পারিবে না। কিন্তু যখন দেখিবে তিনি পরম পিতা হইয়া আপনার কন্যাদিগকে সাজাইয়া দিবার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্প সকল লইয়া প্রতি দিন তোমাদের নিকট আসেন, এবং তোমাদের প্রতি জনকে সুখে রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই তিনি তোমাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন, এক দিনও তাঁহার বিশ্রাম নাই, তখন তোমরা তাঁহাকে বিশেষ রূপে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। নতুবা নদী প্রবাহিত হইতেছে কেন? চন্দ্রোদয় হয় কেন? পৃথিবীতে এত সুখের আয়োজন হইল কেন? এ সকল যুক্তি দ্বারা অতি সামান্য লোকও সাধারণ ভাবে বুঝিতে পারে, যে যিনি জগতের স্রষ্টা যথার্থই তিনি দয়াময়, দয়াময় না হইলে তিনি কদাচ এমন সুন্দর জগৎ সৃজন করিতেন না। ভগ্নি! তুমিও যদি এক প্রকার সাধারণ ভাবে পিতাকে দয়াময় বলিয়া নিশ্চিন্ত হও, তবে যথার্থ ভাল বাসা তুমি ঈশ্বরকে দিলে না। জগতে তাঁহার দয়ার অনেক প্রমাণ আছে তাহা মানিলে; কিন্তু তোমার ঘরে কি তাঁহার দয়ার প্রমাণ নাই? কোটি কোটি লোকের স্রষ্টা এবং রক্ষা কর্তা বলিয়া ঈশ্বরকে কেবল সাধারণ দয়ার আধার বলিলে তাঁহার অপমান করা হয়। যিনি তোমাদের প্রত্যেককে এত ভাল বাসেন, তাঁহাকে কেবল সাধারণ ভাবে ভাল বাসিয়া কি সুখী হইবে? যিনি তোমাদের জন্য নদী সৃজন করিলেন, তিনিই যে প্রতিদিন জল পাত্র হস্তে করিয়া নিজে তোমাদের মুখে জল ঢালিয়া দেন, তাহা কি তোমরা দেখিতে পাও না? তোমাদের রোগ দূর করিবার জন্য ঈশ্বর ঔষধ সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু রোগের সময় ঔষধ আনিয়া মুখে তুলিয়া দেন কে? যদি ঔষধ সেবন করিতে না চাও অনুরোধ করেন কে? অতএব যিনি কেবল নদী, পর্ব্বতের স্রষ্টা তাঁহাকে ভাল বাসিতে বলিতেছি না; কিন্তু যিনি তোমাদের মধ্যে তোমাদের প্রতি জনকে সুখী করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন, সেই সুখময় পিতাকে ভাল বাসিতে বলিতেছি। যদি এই নিকটস্থ পিতাকে ভাল বাসিতে শিখিয়া থাক, তবে তোমাদের মত সুখী আর কেহই নাই, আর যদি

তাঁহাকে ভাল বাসিতে না পার, তবে তোমাদের মত দুঃখিনী আর কেহ নাই। যদি পিতাকে এখনও ঠিক্ আপনার পিতা বলিয়া চিনিয়া লইতে না পারিলে, এত ভাল বাসেন যিনি এখনও যদি তাঁহাকে সমস্ত প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে না পারিলে, এখনও যদি তোমরা তাঁহার দয়ার আরও প্রমাণ চাও, তাহা হইলে তোমরা ধর্ম্মের অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ। এই যে ফুল গুলি নয়ন মন হরণ করিতেছে, এ সমুদয় যেমন ঈশ্বর আপনি আনিয়াছেন, সেইরূপ তিনি তোমাদের মাথায় বাঁধিয়া দিবার জন্য স্বর্গ হইতে তাঁহার প্রেম এবং পুণ্য পুষ্প সকল লইয়া তোমাদের ঘরে আসিয়াছেন; ঈশ্বর তোমাদের মাথায় ধর্ম্মের ফুল বাঁধিয়া দিলে তোমাদের যে সৌন্দর্য্য হইবে, তাহার সঙ্গে কি স্বর্ণ অলঙ্কারের শোভার তুলনা হইতে পারে? তাঁহার পুষ্প সকল দিয়া তোমাদিগকে সুশোভিত করিয়া নিজে সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া তোমাদিগকে ধন্যবাদ করেন, এই জন্য তিনি তোমাদের চারিদিকে দিন রাত্রি বেড়াইতেছেন। তোমাদিগকে কোমল প্রেমের আধার করিয়া, তাঁহার স্বর্গের শোভায় ধন্য করিয়া নিজে ধন্যবাদ করিবেন, এই তাঁহার নিগূঢ় ইচ্ছা। সেই প্রেমময়ী জননী কাছে আসিয়াছেন, অবশ্যই কোন উপকার করিবার জন্য, ইহা দেখিবা মাত্র না কাঁদিয়া থাকিতে পারিবে না। তাঁহার সহবাসের এত সুখ, যে সে সুখের আস্বাদ পাইলে আর তাহা ছাড়িতে পারিবে না। অভাবের সময় অন্ন বস্ত্র পাইলে সকলেই ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া ধন্যবাদ করিতে পারে; কিন্তু যথার্থ সাধ্বী তিনি, যিনি বলেন, পিতা কার্য্য দ্বারা তাঁহার দয়ার পরিচয় দিন আর না দিন, আর তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিব না, তাঁহার দয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। যিনি একবার দয়াময় পিতাকে চিনিয়াছেন, তিনি কি আর বাহিরের কার্য্যে তাঁহার দয়ার প্রমাণ পরীক্ষা করেন? যাহার সঙ্গে তোমাদের আলাপ নাই, যে ব্যক্তি তোমাদের অপরিচিত, সে যদি তোমাদিগকে বলে আমি তোমাদিগকে ভাল বাসি, তাহাকেই নানাপ্রকার প্রমাণ দেখাইতে হয়। সে তাহার ভাল বাসার পরিচয় দিবার জন্য তোমাদের বস্ত্র না থাকিলে তোমাদিগকে বস্ত্র আনিয়া দেয়, এবং অন্য অন্য অভাবের সময়েও নানা-প্রকার সামগ্রী আনিয়া দেয়। এইরূপে যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণরূপে আপ-

নার প্রেমের পরিচয় দিতে পারে, ততক্ষণ সে নানা প্রকারে তাহার ভাল-বাসা এবং ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তোমরা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পার যে সে যথার্থই তোমাদিগকে ভালবাসে, তখন যে অপরিচিত ছিল, তাহাকে তোমরা আপনার বলিয়া গ্রহণ কর। তখন সে যদি দুদিন কার্য্য দ্বারা তোমাদের কোন উপকার নাও করিতে পারে, তাহা হইলে কি তোমরা এই কথা বল যে সে ব্যক্তি আর তোমাদিগকে ভাল বাসে না? অতএব একথা যে বলে, ঈশ্বর আজ আমার আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন না, সুন্দর বস্ত্র দিলেন না, ভাল অলঙ্কার দিলেন না, টাকা দিলেন না আজ তাঁহাকে কিরূপে ভাল বাসিব? সে অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর, সে নিতান্ত অধার্ম্মিক এবং অপ্রেমিক। তাহার ভালবাসা নিতান্ত অসার এবং জঘন্য। তিনিই তোমাদের মধ্যে যথার্থ ব্রাহ্মিকা যিনি বলেন, ঈশ্বর আমাকে ভাল বাসেন, আর তাঁহাকে ইহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে না। একদিন ভাল খাইলে, ভাল পরিলে ইহাতেই যাহারা সন্তুষ্ট তাহারা নিকৃষ্ট; কিন্তু তাঁহারাই তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট যাঁহারা বলেন পিতা আমাদিগকে কিছু দিন আর না দিন, আমরা তাঁহার কাছে বসিলেই সুখী হই। কেবল পিতাকে দেখিলেই তাঁহাদের মহানন্দ হয়। যদি কোন পুস্তকে তাঁহারা পিতার প্রেমের কথা পড়িতে পারেন, তাঁহাদের দুই চক্ষে জল পড়ে। যাই পিতাকে সম্মুখে দেখেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা আনন্দমনে বলেন কেন পিতা আজ আমাদের ঘরে আসিলেন। ঈশ্বরকে দর্শন করা, তাঁহাকে চিন্তা করা, ইহাতেই তাঁহাদের আহ্লাদ। ভগ্নীগণ! তোমরা যদি পিতাকে এরূপে ভাল বাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে তাঁহাকে ভাল বাস বলিয়া অহঙ্কার করিও না। কপট হইও না, সরল অন্তরে বল, তোমাদের মধ্যে কে কত দূর পিতাকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছে? এখন ও কি তোমরা ঈশ্বরকে এই কথা বলিবে, যে পিতা! আগে তুমি যে আমাদিগকে ভাল বাস তাহার প্রমাণ দেখাও, আগে তুমি আমাদিগকে উত্তম অন্ন বস্ত্র দাও, পরে তোমাকে ভাল বাসিব? এসকল নীচ কথা পরিত্যাগ করিয়া কবে তোমারা উচ্চ শ্রেণীর ধার্ম্মিকা রমণী হইবে? যাঁহারা আমাদের পিতাকে ভাল না বাসেন, তাঁহাদিগকে কেন আমরা বড় মনে

করিব ? যাঁহারা ঈশ্বরকে ভাল বাসেন না তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া আদর করিব ? আমরা জানিতে চাই ভগ্নীগণ ! তোমাদের মধ্যে কে কে যথার্থরূপে পিতাকে ভাল বাসেন ! ভালবাসার আগুণ যার প্রাণের ভিতর জ্বলিতেছে সে কি তাহা চাপিয়া রাখিতে পারে ? তুমি পিতাকে ভাল বাস কি না তাহা যে তোমার মুখ বলিয়া দিতেছে। ভাল বাসা যার আছে তার কি দুঃখ হয় ? ভালবাসার সাগরে যিনি নিমগ্ন থাকেন, তাঁহার যে আনন্দ কে ধারণ করিবে ? ঈশ্বরের সুখে যে সুখী, বিপদ প্রলোভন তাহার কি করিতে পারে ? ভগ্নি ! যদি পিতা তোমাকে সুখী করেন, তোমার মুখের প্রফুল্লতা দেখিয়া জগতের লোক বলিবে এই মেয়েটি এত প্রফুল্ল হইল কেন ? এ বুঝি পিতার কাছে কোন নূতন সম্বাদ পাইয়াছে। ইহাকে বুঝি পিতা কোন নূতন সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছেন। এই মেয়েটীকে দুঃখ দাও, ইহার দুঃখ হয় না। সকলে মিলিয়া ইহাকে প্রাণে মারিতে গেলেও এই মেয়েটীর মনের প্রসন্নতা যায় না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর, জানিবে তাঁহার প্রাণের ভিতর সেই ভালবাসা আসিয়াছে, যাহাতে অন্তরে স্বর্গের সুখোদয় হয়। ভালবাসাতেই সুখ, লোকে সুখ দিল না, লোকে কটুকথা বলিল তাহাতে তোমার কি ? তোমার হৃদয়ের ভিতরে যে স্বর্গধাম, আনন্দ উদ্যান, সেখানে যে সহস্র সুখের পুষ্প প্রস্ফুটিত, সুখ তোমার ঘরের মধ্যে, সুখময় ঈশ্বর তোমার মস্তকের উপর। সুখময় তোমার ইহকাল পরকালের দেবতা। এসকল আশার কথা বলিলাম; কিন্তু দুঃখে মর্ম্ম বিদীর্ণ হয়, এখনও কোন ভগ্নীর মধ্যে ইহার উদাহরণ দেখিতে পাইলাম না। কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলাম সেই ভগ্নী কোথায়, যাঁহার মস্তকে সেই নিত্য সুখের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে ? ব্রাহ্মিকা সমাজ ইহার উত্তর দিলেন না। যে দিন দেখিব যে ব্রাহ্মিকা সমাজের কোন ভগ্নী সেইরূপ হইলেন, সেই দিন সেই ঈশ্বরের কন্যা, সেই ব্রহ্ম কন্যার পদতলে প্রণাম করিব। ঈশ্বর তোমাদিগের মধ্য হইতে শীঘ্র সেইরূপ কন্যা প্রস্তুত করুন, আমরা আশা করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি !

গুরু দরবার।



পাঠিকাগণ! তোমরা মানচিত্রে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে পঞ্জাব দেশ লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। শিখ জাতির আদি গুরু ও ধর্ম্মসংস্থাপক মহাত্মা নানক ১৩৯১ শাকে সেই দেশের রাজধানী লাহোর নগরের অনতিদূরে রায়পুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বর এক এবং সর্ব্বব্যাপী এই মহাসত্য তিনি ভারতবর্ষের নানা বিভাগে এবং দূরতর আরব দেশে প্রচার করেন। পঞ্জাবের প্রায় সমুদায় লোক তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করে। শিখ শব্দ শিষ্য শব্দেরই অপভ্রংশ। গুরুনানকের লোকান্তর গমনের পর ক্রমে ৯ জন গুরু শিখধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচার করেন। গুরু গোবিন্দ তাঁহাদের মধ্যে ৯ম গুরু। ইনি সমরপ্রিয় ছিলেন। ইহাহইতে শিখ দিগের যুদ্ধানুরাগ প্রবল হইয়া উঠে। ইহাঁর সময়ে শিখ জাতির উপরি দুর্দ্দান্ত মুসলমান গণের ভয়ানক আক্রমণ হয়। নবাব গুরু গোবিন্দের পিতার প্রাণ সংহার করেন, তজ্জন্য গুরু গোবিন্দ যবনদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যে সকল শিক গুরু গোবিন্দের চেলা বলিয়া পরিচিত, তাহারা তন্নিদর্শন স্বরূপ উষ্ণিষের উপরি চক্র নামক অস্ত্র বিশেষ ও স্কন্ধে তরবারি ধারণ করিয়া থাকে।

অমৃতসরে শিখদিগের প্রধান উপাসনালয়। তাহাকেই গুরু দরবার বলে। দরবার শব্দের অর্থ সভা। অমৃতসর লাহোর নগরের ২৪ মাইল অন্তর, পূর্ব্ব দিকে। ইহা অতি জনাকীর্ণ বৃহৎ নগর, ইহার চতুঃসীমা উচ্চ প্রাচীরে বদ্ধ। পঞ্জাবী লোকেরা এ নগরকে সচরাচর অম্বরসার বলে। নানা প্রকার উৎকৃষ্ট উষ্ণ বস্ত্র ও শাল প্রস্তুত হয় বলিয়া এস্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে গুরু গোবিন্দের সময়ের একটী দুর্গ বিদ্যমান আছে। নগরের ভিতরেই গুরু দরবার, গুরু দরবার অতি মনোহর এবং শিখ জাতির পবিত্র তীর্থ। এখানকার মনোরম দৃশ্য, শিখনর নারীদিগের জীবন্ত উৎসাহ ও প্রেমের ব্যাপার না দেখিলে কাহাকে লিখিয়া কি বলিয়া বুঝান যায় না। এরূপ স্বর্গীয় শোভা ও লোকের অটল ধর্ম্মোৎসাহ, অন্য কোথাও দেখা যায় না। উপরে গুরু দরবারের চিত্র প্রদত্ত হইল। উপাসনা মন্দির একটী সরোবরের মধ্যভাগে নির্ম্মিত, এই পুষ্করিণীটীর নাম অমৃতসরোবর। মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ মূল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত মূল্যবান্ নানাবিধ উজ্জ্বল প্রস্তরের বিচিত্র কারু কার্য্যে শোভিত। দ্বারের উপরি হইতে আরম্ভ করিয়া বহির্ভাগ সমুদায় স্বর্ণ মণ্ডিত। মন্দিরটী তত বৃহদায়তন নহে, কিন্তু তাহার শোভা অতি চমৎকার। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রকোষ্ঠ, মধ্যস্থিত গৃহে সুশোভন আস্তরণ, পটাবৃত বেদীর উপরি পুষ্পমালালঙ্কৃত 'গ্রন্থজি' সংরক্ষিত। সরোবরের তট দেশ হইতে মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত শুভ্রোপল বিনির্ম্মিত একটী বিচিত্র সেতু প্রসারিত রহিয়াছে। সেতুর উভয় প্রান্তে স্তম্ভ শ্রেণী, প্রত্যেক স্তম্ভের চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত। সরোবরের চারি কূল শ্বেত ও কৃষ্ণ মার্ব্বেল প্রস্তরে গ্রথিত। চারি কূলেই উচ্চ অট্টালিকাবলী। জনশ্রুতি যে দরবার মন্দির পঞ্জাবাধিপতি মহারাজা রণজিত্ সিংহের নির্ম্মিত। তাহা হইলে উহা ন্যূনাধিক একশত বৎসরের হইবে। প্রাসাদ শ্রেণীর কতক পাতিয়ালার মহারাজের, কতক কপূরতলার রাজপরিবারস্থ কোন কোন ব্যক্তির ও কতিপয় গুরু ধর্ম্মানুরাগী অন্য অনেক ধনবান্ লোকদ্বারা প্রস্তুত। এই সমুদায় অট্টালিকামালাই দরবার সংক্রান্ত। কিয়দ্দূরে এক পার্শ্বে গুরু বাস নামক উপবন, এই উদ্যানটী শ্রেণীবদ্ধ নানা সুদৃশ্য ফলবান্ বৃক্ষে, শ্বেতোপল বিনির্ম্মিত বিচিত্র বেদিকায়, ইতস্ততঃ শোভিত শুভ্র উপবেশন মন্দিরে,

চতুর্দ্দিক্ প্রসারিত প্রশস্ত বর্ত্মাবলীতে পরম রমণীয় হইয়াছে। উদ্যানের সীমান্তরেই বাবা অটলের অত্যুচ্চ সুদৃশ্য মন্দির। অটল ৪র্থ গুরু হর গোবিন্দের পুত্র ছিলেন। দরবারের এক পার্শ্বে কয়েকটী লোহিত পতাকা আকাশ পথে বায়ু হিল্লোলে ক্রীড়মান। গুরু দরবারের এই সকল বাহ্য সুরম্য দৃশ্য ও গাম্ভীর্য্য দর্শকের নয়ন মনকে বিমোহিত করে।

রাত্রি ৩ ঘণ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় দিবা এবং রজনীর প্রায় ১০.১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রতিদিন দরবারে অবিশ্রান্ত মহোৎসব হয়। অগণ্য লোক উৎসাহ, উল্লাস ও ভক্তি প্রেমে মত্ত হইয়া এখানে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকে। শিক সম্প্রদায় একেশ্বরবাদী। নানক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে কোন দেবদেবীর উপাসনা বিধি নাই, কিন্তু অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে আশ্রয় করিয়া এইক্ষণ ইহাদিগের মধ্যেও নানা প্রকার পৌত্তলিকতাচার প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থজীকেই শিকেরা বিশেষ ভাবে উপাস্য দেব করিয়া তুলিয়াছে। উক্ত অমৃতসরোবরের জলকেও অনেকে পবিত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করে। রাত্রি ৩ ঘটিকার সময়ে গ্রন্থজীকে দোলায় করিয়া বাদ্যোদ্যম সহকারে মন্দিরে আনয়ন করা হয়। গ্রন্থজীর নিকট মোহন ভোগাদি মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। সকলেই মন্দিরে গ্রন্থজীর সম্মুখে ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত করে। এই গ্রন্থজীকে আদি গ্রন্থ বা গ্রন্থসাও বলিয়া থাকে। ইহা গুরুমুখী অর্থাৎ পঞ্জাবী ভাষায় বিরচিত। ১ম অধ্যায় গুরু নানকের, অন্যান্য অধ্যায় ৫ম ও ৯ম গুরু, মিরা বাই, কবির করিদ প্রভৃতি ভক্ত সাধক গণের উপদেশ বাক্যাবলীতে সংরচিত হইয়াছে। ঈশ্বরের নাম সত্য, তাঁহার নামেই পাপীর পরিত্রাণ, দয়া, বিনয় জীবনের অলঙ্কার এই সকল মহাবাক্য বহুলরূপে গ্রন্থসাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দরবারে ভজন গাইবার জন্য অনেক দল গায়ক নিযুক্ত আছে। তাহারা পর্য্যায় ক্রমে তবলা তম্বুরাদি যন্ত্র সহকারে শ্রোতৃমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া গান করিয়া থাকে। অপরাহ্ণেই বহু লোকের সমাগম হয়। তখন সমারোহের সীমা পরিসীমা থাকে না। এক দিকে মন্দিরে গায়কগণ সুললিত স্বরে ঈশ্বর-গুণ ঘোষক সঙ্গীতের অমৃত লহরী চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতেছে, শত

শত লোক ভক্তি পুলকিত অন্তরে জয় প্রভুজি বলিয়া প্রণিপাত ও মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে, কোথাও বা সরোবর কূলস্থ অট্টালিকায় তানলয় বিশুদ্ধ স্বরে ভজন হইতেছে, স্থানান্তরে তরুতলে মার্ব্বেলের বেদিকায় ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ, কোথাও কথকতা ও ব্যাখ্যা হইতেছে। শত শত উৎসাহী শ্রোতা অবহিতমনে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেছে। বাস্তবিক সেখানে ধর্ম্মোৎসাহ উল্লাস ও উদ্যমের যেন জীবন্ত মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান। সেখানকার এই ব্যাপার দেখিলে নির্জীব আত্মা সজীব হয়, শুষ্ক হৃদয় সরস হয়, পাষাণ তুল্য কঠিন মনেও ভক্তির কুসুম বিকশিত হয়।

শৈশবাবস্থায় উপকথা শ্রবণ।

মাতাই শিশু চরিত্রের প্রথম নির্ম্মাতা। তাঁহারই হস্তে শিশুদিগের অন্তঃপ্রকৃতির গঠন আরম্ভ হইয়া উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে। এই সময়ে যে কতদূর সতর্কতা আবশ্যক একটু ভাবিয়া দেখিলে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মানবীয় প্রকৃতির স্ফূর্ত্তির সীমা নাই। অনন্ত ভাবিকাল ইহাকে পোষণ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছে। এই ক্রমোন্নতিশীল মানব প্রকৃতির প্রথম পত্তন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। পত্তনে দোষ থাকিলে অন্যান্য অংশ নির্দ্দোষ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

মাতার ন্যায় অন্যান্য পরিজন বর্গও শিশু চরিত্রের প্রথম গঠনের সহায়তা করেন। শিশু যে কোন অঙ্কে পরি ভ্রমণ করে তাহা হইতে কিছু না কিছু লাভ করিয়া থাকে। শিশুদিগের অন্তঃকরণ যার পর নাই অনুকরণপ্রিয়; যাহা দেখে যাহা শুনে ভালই হউক আর মন্দই হউক—তৎক্ষণাৎ তাহার অভ্যাস আরম্ভ করে। এইরূপে অতি সত্বর বেগে শিশুচরিত্রের গঠন সম্পাদিত হইতে থাকে।

যে সমস্ত উপকরণে শিশুচরিত্র সংগঠিত হইতে থাকে, তন্মধ্যে গল্প শ্রবণ একটী প্রধান। শিশুচিত্ত পক্ষে গল্পের ন্যায় আর কিছুই তাদৃশ হৃদ্য ও উপাদেয় নহে। বাল্যকালে গল্প শুনিবার প্রবৃত্তি যে কতদূর

বলবতী থাকে, তাহা ব্যক্তি মাত্রেই আপনার বাল্যাবস্থা স্মরণ করিয়া অনু-ভব করিতে পারেন। আমরা বাল্যকালে সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর বা উঠানে বসিয়া বৃদ্ধ পিতামহী বা মাতামহীকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক কেবল গল্প শুনিতাম; গল্প শুনিবার সময় কখন কখন ভূত প্রেত যক্ষ রাক্ষসের কথা শুনিতে শুনিতে ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িতাম; কখন কখন তাহাদের অদ্ভুত কার্য্য কলাপের কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতাম, কখন বা কৌশল সহকারে সুচতুর পথিক দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার পাইলেন শুনিয়া আনন্দে উল্লম্ফিত হইতাম, কখন বা পরোপকারী গৃহ-স্থের দানশক্তির ব্যাখ্যা শুনিয়া মন কত উদার হইয়া যাইত। আমরা আহার করিতে করিতে আর আহার করিতাম না, পরে যখন 'তাল পত্রের খাঁড়া ও পক্ষীরাজ ঘোড়ার' গল্প আরম্ভ হইত, তখন আমরা সেই উপ-ন্যাস সুধা মাখাইয়া অন্নগ্রাস মুখে দিতাম এবং অল্পে অল্পে তাহা চর্ব্বণ করিতাম, পাছে শীঘ্র অন্ন ফুরাইয়া গেলে উপকথাও ফুরাইয়া যায়।

যখন উপকথার প্রতি শিশুগণের প্রবল অনুরাগ, তখন যে সে অনুরাগ তাহাদের চিত্তোৎকর্ষ সাধনের এবং চরিত্র সংগঠনের প্রধান সহায় হইবে বলিয়া বিধিবিহিত হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বঙ্গীয় সমাজের শিক্ষিতা নবীনারা নব্য সভ্যতার অনুরাগে শিশু শিক্ষার এই চিরাগত উপায়কে অবহেলন করি-তেছেন। তাঁহারা অমিশ্রিত সত্য গল্প কোথাও অন্বেষণ করিয়া পান না এবং অনর্থক কল্পিত উপকথা শুনাইয়া শিশু সন্তানের হৃদয়ে কুসংস্কারের বীজ বপন করিতেও চান না; সুতরাং তাহার উপকথা শুনিবার আসক্তি স্ফূর্ত্তিহীন ও নির্জ্জীব হইয়া যাইতেছে, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর ও মন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে এবং স্বাভাবিক কল্পনার সাহায্য না পাইয়া ধর্ম্মভাব সকল সঙ্কুচিত হইয়া কেবল যুক্তি ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বিচরণ করিতে শিখিতেছে।

সচরাচর তিন প্রকার উপকথা প্রচলিত দেখিতে পাই। যে সকল উপকথা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাতে স্বভাবের অতীত কাল্পনিক দৈব শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সকল উপকথা শুনিতে শু-

নিতে লোকাতীত দৈব শক্তির উপর শিশুদিগের বিশ্বাস ও নির্ভর স্বভাবতঃ ধাবিত হয়, এবং মানবীয় মনের নানাবিধ ধর্ম্মভাব উন্নত ও সম্পুষ্ট হইতে থাকে। ভূত, পিচাশ, রাক্ষস, দৈত্য প্রভৃতির অলৌকিক প্রভাব, বায়ু বহ্নি, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতানিচয়ের অদ্ভুত শক্তি ও গুণবর্ণন এই শ্রেণীর উপকথার অন্তর্গত। যে সকল উপকথা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত তাহাতে মনুষ্যের বিচক্ষণ বুদ্ধি বা অদ্ভুত শক্তির নিকট স্বভাবের অতীত দৈব শক্তির পরাজয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল উপকথা শুনিতে শুনিতে শিশুদিগের মানসিক সাহস ও আত্ম নির্ভরের ভাব স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে এবং উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতি মানবীয় প্রকৃতির নানা বিধ কার্য্যশক্তি পরিপুষ্ট হইতে থাকে। যে সকল উপকথা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত সে সমস্ত নীতিমূলক। মনুষ্যের দয়া ধর্ম্ম সম্পোষণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। এই সকল উপকথা কখন বা প্রথম শ্রেণী ও কখন বা দ্বিতীয় শ্রেণীকে আশ্রয় করিয়া কখন বা স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করে।

এ দেশের যত উপকথা সমস্তই প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এই জন্যে এ দেশের লোকের ধর্ম্মভাব অধিক, সাহস অল্প এবং আপনার শক্তির উপর বিশ্বাস ও নির্ভর অল্প। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশের অধিকাংশ উপকথা দ্বিতীয় শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে। সেখানকার সমুদায় গল্পই দৈত্য বংশ ধ্বংসক হার্কুলিস্ বা জ্যাকের উপকথার ন্যায় মানবীয় শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে। এই জন্য সেখানকার লোকদের সাহস ও বীর্য্য অধিক; আত্ম নির্ভর অধিক এবং ধর্ম্মভাব অল্প।

এই তিন শ্রেণীর গল্পই আমাদের শিশুদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয়। যে সকল মহিলা আপন আপন শিশুদিগকে যথা নিয়মে লালন পালন করিতে চান, তাঁহারা কল্পনাকে প্রশ্রয় দিবার ভয়ে শিশুশিক্ষার এই প্রশস্ত উপায় অবহেলা করিবেন না। পূর্ব্বতন শিশুরা যেমন অল্প বয়সে ধর্ম্ম ভীরু হইত, এক্ষণকার শিশুরা তেমন হয় না। এই সকল শিশুরা যুবাকালে স্বভাবতঃ ধর্ম্মভাবশূন্য হইয়া জন সমাজের অশেষ অনিষ্ট সাধন করিবে

সন্দেহ নাই। ইহাদের চরিত্রের জন্য ইহাদের জননী ও অন্যান্য পরিবার বর্গ দায়ী তাহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক।

বাল্যকালে উপন্যাস শ্রবণ দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকল যে কতদূর তেজস্বিনী হয় তাহা অনেকে অনুভব করেন না; এক্ষণকার বিজ্ঞ লোকেরা ইহার কেবল দোষ ভাগই দর্শন ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুবিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাস লেখক সর ওয়াল্টর স্কট মানবীয় প্রকৃতি সুচিত্রিত করিতে যে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার একটী প্রধান কারণ শিশুকালে উপন্যাস শ্রবণে তাঁহার ঐকান্তিক ঔৎসুক্য। শুনা যায় তৎকাল প্রচলিত কোন উপকথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুকল্পিত উপন্যাস শ্রবণে শিশুদিগের মনে ধর্ম্মস্পৃহা, দেশ হিতৈষিতা, সাহস ও বীরত্ব বদান্যতা, পাপের প্রতি ঘৃণা ও পুণ্যের প্রতি অনুরাগ যেরূপ বর্দ্ধিত হয় সহস্র উপদেশে সেরূপ কখনই হইতে পারে না। প্রাচীন হিন্দু নর নারী দিগের চরিত্রে যে সকল সদ্গুণ লক্ষিত হয়; বাল্যকালে রামায়ণ ও মহাভারত বর্ণিত ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতির উপাখ্যান ভাগ শ্রবণই তাহার মূল কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম শ্রীমতী রাণী সরৎ সুন্দরী হিন্দু আছমিটী ফণ্ডে ১০০০ টাকা এক কালীন দান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মহারাণী স্বর্ণময়ী এই শুভ কার্য্যে ৪০০০, টাকা দান করেন। আমাদিগের দেশের অন্যান্য দয়াবতী রমণী এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে অত্যন্ত সুখের হয়।

২। আমরা অবগত হইলাম ভারত সংস্কার সভার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমতী কৃষ্ণ কামিনী দেবী রাণাঘাটে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। বিদ্যালয়টী উত্তম চলিতেছে, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী দিগের দ্বারা এরূপ অনুষ্ঠান যত হইতে থাকিবে দেশের ততই মহোপকার হইবে।

৩। উত্তরপাড়ার হিতকরী সভার একাদশ বার্ষিক বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এই সভার সভ্যেরা স্ত্রী শিক্ষার জন্য যে রূপ উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাহাদিগকে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

৪। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। লেডি ফিয়ার সভাপতি ছিলেন, পারিতোষিক বিতরণ স্থলে অনেক গুলি হিন্দু মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

বামাগণের রচনা।

মনের প্রতি।

কি কার্য্য সাধিলে এই ভবে এসে মন!
একবার না স্মরিলে জগৎ শরণ॥
বৃথা কার্য্যে কাটাইলে সময় হেলায়।
ক্ষণকাল নাভাবিলে শেষের উপায়॥
সুখ, সুখ, করি সদা করিছ রোদন।
ভজিলে না তায়, যিনি সুখের কারণ॥
কেমনে পাইবে সুখ পাপ আচরণে।
বিরাজে বিমল সুখ বিভু আরাধনে॥
অতএব কথা শুন মনরে আমার।
ভজরে ঈশ্বরে সুখ পাইবে অপার॥
সদানন্দময় প্রভু সকলের সার।
অনাদি অনন্ত তিনি নিত্য নির্ব্বিকার॥
দুস্তর এ ভবার্ণবে যিনি কর্ণধার।
তাঁহাকে ভুলনা মূঢ় মনরে আমার॥
সময় থাকিতে মন ঈশ নাম ধর।
কায় মনোবাক্যে তাঁরে নমস্কার কর॥
প্রীতির কুসুমে মাখি ভকতি চন্দন।
তাঁহার চরণে সদা কররে অর্পণ॥
প্রাণ মন নিবেদন কর অকপটে।
পাইবে অক্ষয় সুখ পিতার নিকটে॥
যশঃ লভিবারে কেন ব্যাকুল এমন,
কোন্ গুণে গুণী তুমি হইয়াছ মন?
কেমনে পাইবে যশঃ বলহে আমায়।
ধর্ম্মহীন জনে যশঃ কখন কি পায়?
ভেবে দেখ পূর্ব্বে কত মহা মুনি গণ,
বাল্মীকাদি করি যত ধার্ম্মিক সুজন।
প্রাণ পণে করিলেন ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
অদ্যাপি তাঁদের নাম হতেছে কীর্ত্তন॥
সংসারের সর্ব্ব সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি,
যশ স্তম্ভ রাখিয়া গেছেন স্বর্গে চলি॥

এখনও তাঁহাদের কীর্ত্তি সমুদায়,
অটল ভাবেতে সদা বিরাজে ধরায়।
যশস্বী হইতে যদি চাও মূঢ় মন,
পাপ আচরণে তবে দেও বিসর্জ্জন॥
সৎকার্য্য সাধহ সদা ঈশ্বর স্মরিয়া।
পাইবে চরমে যশঃ ঈশ স্থানে গিয়া॥
অন্যে কিসে ভালবাসে, সদা এই আশা।
ভাব নিজ মনে, কি না আছে ভাষা॥
প্রেম শূন্য হলে পাইবেনা প্রিয় জন,
অতএব কর অঙ্গে প্রেম বিলেপন॥
অন্তর বিশুদ্ধ কর প্রফুল্ল হৃদয়,
ভাল বাসিবেন তোমা দয়ার নিলয়॥

THE BAMABODHINI PATRIKA.

PORTRAIT OF AN ENGLISH CHILD.

(From a Lady in England.)

The accompanying illustration, drawn by an English lady, is a lithograph, which means a drawing on stone. Lithographs are made in the following manner. The drawing is made on a specially prepared stone, as smooth as paper, with so-called lithographic chalk, a compound of tallow and lamp-black. As it makes marks which will not rub out, the outline must be carefully drawn on a sheet of paper first, and then transferred to the stone by means of tracing-paper. When the drawing is finished, the stone is taken to a professional lithographer, who washes it with acid. This acid eats into the stone at those places only which have been touched by the greasy chalk, so that each mark of the drawing makes a little scratch or indentation in the stone. Into these printer's ink is rubbed, and on strong pressure being applied, by means of a printing-press, the drawing is produced in the form which you see.

